নগ্ননির্জন

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধদেব গুহ

॥নগ্ননির্জন॥

পুবের পাহাড়টার উপরে দাঁড়িয়ে রাকেশ চারদিকে চাইল।

রোদ উঠে গেছে। আদিগন্ত কুয়াশার মাকড়শার জাল ছিন্নভিন্ন করে ভূলুণ্ঠিত করে নরম সোনালি আভাস বনে-পাহাড়ে, কুল্‌থী ক্ষেতে, সর্ষে ক্ষেতে ছড়িয়ে গেছে। এ-কে রোদ বলে না—এ এক রকমের স্বর্গীয় ভৈরবী অভিজ্ঞতা। এ রকম সকালের সামনে দাঁড়ালেই ভৈরবী শুদ্ধ ও কোমল পর্দাগুলি চোখের সামনে একটি গাঢ় কমলা-রঙা ডালিয়ার পাপড়ির মতো এক এক করে খুলে যেতে থাকে।

সুব্বল শুধোলো, এবার ফিরবে?

রাকেশ বলল, না।

ও বলল, সেটা ভাল হবে।

চতুর্দিকে শুধু সবুজ, সুপুষ্ট, প্রায়-নিশ্ছিদ্র জঙ্গল। ঘন চুলের মত ঠাসবুনন—সুগন্ধি। শাল, শিশু, অর্জুন, কুচিলা নানারকম বাঁশ, সেগুন এবং আরো অনেক নামজানা ও অজানা গাছের জঙ্গল।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক দূরে, নীচে কতগুলো সেগুন গাছের আড়ালে ঘুমিয়ে থাকা বাঘমুণ্ডা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ফরেস্ট বাংলোর সাদা দেওয়ালের পেছনের অংশটুকু দেখা যাচ্ছে শুধু। এই পাহাড়ের পা ছুঁয়ে চলে গেছে কুরাপে যাওয়ার জংলী পথ। অন্য পথ গেছে পূর্ণাকোট। পূর্ণাকোটের মোড় থেকে সোজা গেলে টুল্বকা—ডানে গেলে টিকরপাড়া—বাঁয়ে গেলে অঙ্গুল।

অফিস নেই, বাস নেই, মিছিল নেই, অন্য লোকের চীৎকার নেই, নিজের চীৎকারের ক্লান্তি নেই। এখানে শুধু ভালোলাগা আছে। পলাতক কাকে বলে রাকেশ জানে না। যদি কেউ ওকে তা বলে বলুক। কিন্তু এই পালিয়ে আসায় কোনো লজ্জা নেই। রাকেশ মাঝে মাঝেই এইরকম পালিয়ে আসে।

সুব্বল সামনের পাহাড় ও উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় কতকগুলো বড় কালো পাথর যেখানে একটার পর একটা সাজিয়ে রাখার মতো করে সেজে আছে—সেখানের একঝাঁক কুচিলা গাছের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ঐদিকে যেতে হবে। বলেই আগে আগে পথ দেখিয়ে পাহাড় নামতে শুরু করল। রাকেশও শুনতে পাচ্ছিল, কতগুলো বড়কি ধনেশ, ইংরেজীতে যাকে গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্ণবিল্‌স্ বলে, ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ করছিল। সেদিকে ওরা সাবধানে ভিজে পাথরে-জঙ্গলে পা ফেলে ফেলে নেমে চলল।

সুব্বল বলে, ‘বড্ড’ কুচিলা খাঁই, আর ‘সান’ কুচিলা খাঁই। শিকারে এসে এসে যতটুকু এ অঞ্চলের ভাষা না শিখলে নয়, ততটুকু শিখে ফেলেছে রাকেশ। আরো বেশী শিখতে পারলে খুশী হতো—কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বড্ড মানে বড়, সান মানে ছোট, ইত্যাদি ইত্যাদি। যতটুকু বলতে পারে, বলে—যতটুকু না পারে হাত পা নেড়ে মুখ

বিকৃতি করে বুঝিয়ে দেয়। তবে, একটু ভাল করে শুনলে জঙ্গলের ওরা কি বলছে তা বুঝে নিতে পারে আজকাল। তাছাড়া সুব্বলও মোটামুটি ভাল বাংলা বলতে পারে।

সুব্বল নাম হলে কি হয়, সুব্বল সুবল-সখা নয়। অত্যন্ত সাহসী। এখানে সামান্য জমি-জমা আছে। শিকারে শখ খুব। নিজের গাদা বন্দুক দিয়ে আগে আগে অনেক শিকার করেছে। এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কড়াকড়িতে আর পারে না। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ফোটা-কার্তুজের বারুদের গন্ধে মাতাল হওয়া।

ওরা বেশ খানিকটা নেমে এসেছে। এদিকটা বেশ খাড়া। সাবধানে নামতে হচ্ছে। রাকেশের হাল্‌কা চার্চিল দো-নলা শটগানটাও যেন এখন ভারী-ভারী ঠেকছে। সামনের বড় কুচিলা গাছটির একেবারে মগডালে কতগুলো বড় বড় ঠোঁটওয়ালা ধনেশ কামড়াকামড়ি করছে। ঝাঁপাঝাঁপি করছে। এগুলো দেখলেই রাকেশের শহুরে জীবনের চারপাশের ভিড় করা চেনা লোকদের কথা মনে পড়ে। অন্য পাখি মারার পর কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে মনটা একটু খারাপ লাগে, কিন্তু এগুলো মেরে পৈশাচিক আনন্দ হয় রাকেশের। মরার পরও এদের পা দিয়ে লাথি মারতে ইচ্ছা করে। এদের স্বার্থপর বড় বড় ঠোঁটগুলো জুতো দিয়ে পিষে দিতে ইচ্ছে করে।

যে পাখিটিকে আকাশের পঠভূমিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল—একটি পাথরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রায় সোজা উপরে বন্দুক তুলে তাকে গুলি করল রাকেশ। পাখিটা লদ্‌-লদ্‌ করতে করতে ডালে ডালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পাথরের উপরে আছড়ে পড়ল। সুব্বল তাকে আনতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে অন্য একটি পাখি এসে একেবারে তার সামনের ডালে বুকে পেতে বসল। গুলির শব্দে সে গাছের সব পাখি উড়ে গেল, অথচ এ অন্য গাছ থেকে উড়ে এসে বসল।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু কারো স্পর্ধা সহ্য করেনি, করে না কোনোদিন। রাকেশ বন্দুক তুলেই বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করল। এতক্ষণ যা সপ্রাণ ছিল, যা সরব ছিল, যা আওয়াজ করে ভবিষ্যময় ছিল তা নিমেষে নিভে গেল। অতীতে পর্যবসিত হয়ে গেল। ধপ্‌ আওয়াজ করে নীচে পড়ল। ঠোঁট দিয়ে একফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পাথরে পড়ল।

রাকেশ বন্দুকের ব্রীচটা খুলতেই ফোটা টোটাগুলি লাফিয়ে বেরোল। বারুদের গন্ধ নাকে এল। সুব্বল টোটাগুলি কুড়িয়ে নিল। যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক লোক হলে হয়তো এমন করত না। কিন্তু রাকেশ এগিয়ে গিয়ে গলফ্‌-শু দিয়ে পাখিটিকে উল্টে দিল। ধনেশ চোখ বুজেই ছিল। রাকেশের মুখে কেমন এক অদ্ভুত, অর্থহীন, অস্বাভাবিক হিমেল হাসি ফুটে উঠল।

এবার ওরা দু'জনে পাহাড় বেয়ে নেমে বাঘমুণ্ডা গ্রামের পেছনের জঙ্গলের পায়ে-চলা সুঁড়িপথ ধরে বাংলোর দিকে আসতে লাগল।

পথের ভারী লাল ধুলো শিশিরে ভিজে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বাঁশপাতা থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। কতগুলি টুক্‌লি-পাখি টাকুর-টুসি টাকুর-টুসি করে ছোট ছোট পিয়াশালের চারায় চারায় কী এক উৎসারিত প্রাণভরা আনন্দে ডানা ফরফরিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। পথের ধুলোয় একটি বড় চিতার হেঁটে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে। পথ

ধরে বরাবর সেও বাংলোর দিকেই হেঁটে গেছে। খুব সম্ভব শেষ রাতে। একদল ঘুঘু গিন্নী জাম রঙের উপর সাদা ফুট্‌কি ফুট্‌কি বালাপোষ মুড়ে কুল্‌থীক্ষেতের মাঝে একটি কালো কলাগাছের পাতায় সারি বেঁধে বসে—ঘুম-ভাঙানো নরম নূপুর বাজিয়ে চলেছে—ঘুঘুর্-ঘু—ঘুর্র্-ঘু। ঘুঘুর্-ঘু—ঘুর্র্-ঘু।

ওরা বাংলোর হাতায় ঢুলে পড়ল। পেছন দিক দিয়ে বাংলোটি প্রদক্ষিণ করে সামনে গেল। শ্রুতি ঘুম ভেঙে উঠে বাংলোর হাতায় পায়চারি করছিল। অর্জুনকে দেখা গেল না। রাকেশ পৌঁছেই বলল, চা কোথায়? ঠাণ্ডায় জমে গেছি।

শ্রুতি বলল, একদম রেডি। পরক্ষণেই পাখিগুলোর দিকে নজর পড়তেই চোখ বড় বড় করে বলল, ওগুলো কি পাখি রাকেশদা?

সুব্বল উত্তরে বলল, কুচিলা খাঁই?

শ্রুতি বলল, কি খাঁই।

রাকেশ হেসে বলল, খাঁই—খাঁই।

শ্রুতি গলা নামিয়ে বলল, আপনার অসভ্যতা কবে যাবে বলতে পারেন?

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, জীবনে না। তারপর বলল, পাখিগুলো ধনেশ পাখি। এর তেলে অবাধ্য বাতও সারে। তোমার বাত সারাবার জন্যে নিয়ে এলাম।

শ্রুতি বলল, আমার বাত নেই।

বাত আছে। তোমার হৃৎপিণ্ডে বাত আছে। হৃদয়চালনার জন্য তোমার ধনেশের চর্বি প্রলেপের প্রয়োজন।

শ্রুতি উত্তর না দিয়ে সুব্বলকে বলল, কী করে মারলে সুব্বল?

সুব্বল বলল, সে বাবু মেরেছেন।

শ্রুতি বলল, বাবু পাখি ছাড়া আর কি মারবেন? তা তো জানি, কিন্তু মারা হল কী করে?

রাকেশ বলল, প্লিজ শ্রুতি, বাঘ-বাইসন-হাতি হয়, কী করে মারা হল বলা চলতে পারে—কিন্তু পাখি মারার গল্প ইনিয়ে-বিনিয়ে আমার কানের কাছে কেউ বলুক সে অসহ্য।

শ্রুতি এগিয়ে গিয়ে পাখিগুলো দেখল, ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখল। বলল, ইস্ কী সুন্দর! কেন মারলেন?

রাকেশ উত্তর না দিয়ে ওর ঘরে ঢুকে ক্লিনিং রড বের করে বন্দুকটা পরিষ্কার করতে লাগল—শিশু-সূর্যের দিকে নলটা উঠিয়ে চোখের মধ্যে চোখ লাগিয়ে দেখল ঝিক্‌মিক্ করছে কিনা।

সুব্বল পাখি দুটি নিয়ে বাবুর্চিখানার দিকে চলে গেল। শ্রুতি সুব্বলকে দিয়ে বলে পাঠাল, রাজুয়াড়ুকে বলো, চা নিয়ে আসবে।

রাকেশ শুধোল, তুমি চা খাওনি এখনো?

না।

কেন না? তোমাকে তো প্রথম দিনই বলেছি যে শিকারে বেরোলে ফেরার কখনো ঠিক থাকে না—তা বলে তুমি আমার জন্যে বসে থাকবে? শ্রুতি বলল, সে আমি বুঝব, আপনি শিকারে নিয়ে এসেছেন বলে কি আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতাও নেই?

রাকেশ বন্দুকটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গান-র‍্যাকে রাখতে রাখতে বলল, কি আমার ব্যক্তি রে! তারপর বাইরে এসে রোদে, হাসনুহানা ঝোপের পাশে বেতের চেয়ারটা টেনে বসে, টোব্যাকের পাউচ বের করে পাইপটা ভরতে লাগল।

তারপর শুধোল, অর্জুন কি কাল রাতেও—

শ্রুতি বলল, বলবেন না ওসব কথা। আমার শুনলেই মেজাজ গরম হয়ে যায়। জীবনকে পরিমিতভাবে প্রতিদিন উপভোগ করার নামই ভালো লাগা। অথচ সে কথা কে বোঝে? খাওয়ার পর আপনি তো শুতে গেলেন—তারপর ও প্রায় একঘণ্টা বসে বসে বোতলটা শেষ করেছে। কেন, আপনি শুনতে পাননি কিছু?

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বলল, নাঃ! আমি খাওয়ার টেবল্ থেকে উঠে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়েই শুয়ে পড়েছিলাম।

শ্রুতি বলল, তাই।

রাকেশ অর্জুনের কথা ভাবছিল। শ্রুতির মত মেয়ে যাকে ভালোবেসে বিয়ে করল সে কেন এমন করে, সে কেন এমন হয়! ও বোধ হয় ভাবে ওর জীবন ফুরিয়ে আসছে। 'টাইম ইজ রানিং আউট।' কিন্তু ও-ই যদি তা ভাবে, তা হলে রাকেশ কী ভাববে?

রাজুয়াড়ু চা নিয়ে এসে বেতের টেবলে রাখলে। শ্রুতি বলল, চা-টা একটু ভিজুক, দেখি আর একবার চেষ্টা করে ওঠাতে পারি কিনা। বলে শ্রুতি উঠে নুড়ি মাড়িয়ে ঘরে গেল, ঘরে গিয়ে কি বলল, শোনা গেল না। শুধু অর্জুনের রাগ-রাগ গলা শোনা গেল—"প্লিজ, আমাকে ডিসটার্ব কোরো না।"

শ্রুতি ফিরে এল। রাকেশের মনে হলো, ও অপ্রতিভ বোধ করছে। রাকেশ মুখ নিচু করে পাইপটি ভরতে লাগল। শ্রুতি টি-কোজীটি তুলে নিয়ে বড় চামচে নেড়ে নেড়ে কেতলিতে চায়ের পাতাগুলো নাড়তে লাগল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি আমাকে দেখে মনে মনে হাসেন, না রাকেশদা?

রাকেশ চকিতে ব্যথিত মুখ তুলে বলল, কেন? তুমি কি আমাকে এতদিনে এই বুঝেছ শ্রুতি? আমার গর্ব আছে যে, তোমাকে আমার মতো করে এ জন্মে আর কেউ বোঝেনি। তোমাকে আমি দেখি, বুঝি এবং তাতে তোমার প্রতি আমার ভালো লাগাটুকুই শুধু বাড়ে। তোমাকে ভুল বুঝেছি এমন তো কখনো হয়নি।

দেশলাই জ্বেলে রাকেশ পাইপটা ধরালো। বলল, তুমি আমার কাছে কখনো শুকনো মুখে আসবে না। তোমার শুকনো মুখ দেখলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

শ্রুতি কথা না বলে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল। তারপর এক চামচ চিনি এবং সামান্য দুধ মিশিয়ে পেয়ালাটি রাকেশের হাতে এগিয়ে দিল। রাকেশ নীচু হয়ে পেয়ালাটি নিল।

শ্রুতি বলল, রাকেশদা, ও কি? আপনার কপালের দু'পাশে যে অনেক চুল পেকে গেছে!

রাকেশ হেসে বলল, কি করব? গেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

শ্রুতি বলল, সে কথা নয়। তবে দেখতে ভাল লাগে না।

কিছু করার নেই। রুমনি বেঁচে থাকতে এ নিয়ে রোজ চেঁচামেচি করত–রোজ সকালে সন্না নিয়ে আমার চুলের কল্যাণে লাগত–তাতে আমার যা যন্ত্রণা হতো, তার চেয়ে বার্ধক্যের যন্ত্রণা অনেক ভাল ছিল। একটা পাগলী ছিল রুমনিটা। আমার ভারী ভাল বউ।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে রাকেশের চোখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, সত্যি, রুমনিদির মতো মেয়ে আমি তো আর দেখলাম না। কি করে যে কি হয়ে গেল। দু'দিনের মেনেনজাইটিসে কেউ মারা যেতে পারে–ভাবা যায় না। আর কম বয়সে।

রাকেশ বলল, থাক ওসব কথা শ্রুতি। সব প্রিকন্ডিশান্ড, কপালে যা আছে, মানে যা ছিল, তা ঘটেছে।

শ্রুতি বলল, আপনি কপাল মানেন?

রাকেশ বলল, নিশ্চয় মানি। কপাল না মেনে উপায় আছে? কপাল না মানলে আমার এত দীর্ঘশ্বাস এই কপালের দোহাই দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম কি করে?

শ্রুতি নিজের পেয়ালায় চা ঢালল। রাকেশ উঠে আবার ঘরে গেল। ঘরে গিয়ে ফোর সেভেনটি ফাইভ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটি নিয়ে এসে ফ্লানেল দিয়ে মুছতে লাগল।

শ্রুতি বলল, আমি কেবল আপনার বন্দুক রাইফেলের যত্ন দেখি আর ভাবি, আমাকে যদি কেউ এমন যত্ন করত।

ঠাট্টা নয়। সেনাবাহিনীতে একটি কথা চালু আছে, জান? ওরা বলে–'ইউ মাস্ট কিপ ইওর রাইফেল অ্যাজ ইউ কিপ ইওর ওয়াইফ।'

সত্যি?

সত্যি।

ওরা চা খাচ্ছিল। চুপচাপ। এমন সময়–

স্লিপিং স্যুট পরেই, গায়ে একটি কম্বল জড়িয়ে অর্জুন তেতুর-চোখে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পাতলা ছিপছিপে চেহারা–মাজা-মাজা রঙ–বেশ বুদ্ধিমান মুখ–দুটি বড় বড় অভিব্যক্তিময় চোখ। বলল, বাঃ রাকেশদা, আমাকে ফেলেই চা খাওয়া হয়ে গেল!

রাকেশ বলল, এসো এসো, এখানে চলে এসো। সবে এক কাপ খেয়েছি।

অর্জুন বাথরুম-স্লিপার পায়ে গলিয়ে কম্বল সমেত এসে চেয়ারে বসল।

শ্রুতি বলল, ও কি? কম্বল গায়ে কাটিহারের কুলির মতো ঘোরার কি মানে হয়?

আঃ কি আরাম, বলে দুষ্টুমি করে অর্জুন শ্রুতির দিকে চাইল।

এইজন্যেই রাকেশের ভাল লাগে অর্জুনকে। হুইস্কি-টুইস্কির ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে হয়তো–তাও মনে হয় বাইরে-টাইরে এসেই করে–জানে না–নইলে ছেলেটি ভারী বুদ্ধিমান এবং সোজা টাইপের। মনে মনে একেবারে সাদামাঠা। দশ বছরের ছেলের মতো সরল।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন শুধোল, কি শিকার হলো?

শ্রুতি উত্তর দিল, ধনেশ পাখি। তোমার বাতের চিকিৎসা হবে।

বড় বড় চোখ করে অর্জুন বললে, সিরিয়াস্‌লি? তুমিই বুঝি রাকেশদাকে মারতে বলেছিলে? বাঁচালে। রাতে বাঁ পায়ের হাঁটুটা যা কন্‌ কন্‌ করে না–কোমরটাও, বোধ হয় গেঁটেবাত হয়েছে–বলেই শ্রুতির দিকে চাইল, ওকে রাগাবার জন্যে।

শ্রুতি চোখে আগুন জ্বেলে বলল, আরো অনেক কিছু হবে। এখুনি কি!

অর্জুন তবু একটুও না রেগে বলল, দাও চা দাও।

অর্জুনকে চা ঢেলে দিয়ে শ্রুতি বলল, রাকেশদা, এলা চিঠি লিখেছে। কাল রাতে ফরেস্টবাবু টিকরপাড়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আজ সকালে দিয়ে গেছেন।

রাকেশ রাইফেলের সেফ্‌টি ক্যাচটায় তেল দিতে দিতে বলল, কী লিখেছে পড়ো না।

শ্রুতি এক দৌড়ে খাবার ঘর থেকে চিঠিটা নিয়ে এল। আগের থেকে শ্রুতি সামান্য রোগা হয়েছে। পেছন থেকে আচম্‌কা চাইলে ওকে হঠাৎ রুমনি বলে ভুল হয়।

শ্রুতি চিঠিটা এনে খাম খুলে পড়তে লাগল।

মুসৌরী

'সোনা বাবা,
তুমি কি কি শিকার করলে কিচ্ছু লেখোনি। বুঝতে পাচ্ছি, তোমরা যেখানে আছো সেখান থেকে চিঠি এখানে আসতে অনেকদিন লাগে। তাই তোমার উপর রাগ করিনি, দেরি করে চিঠি দিয়েছো বলে।

তুমি আর হরিণ-টরিন মারোনি তো? হরিণ মারলে তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি বাঘমুণ্ডা জায়গাটা কত সুন্দর। এবার গরমের ছুটিতে তোমার সঙ্গে কোনো জঙ্গলে যাব। আমার জঙ্গল পাহাড় খুব ভাল লাগে, জানো বাবা।'...

অর্জুন বলল, বাপ্‌কা বেটি। রাকেশ নিঃশব্দে হাসলো।

শ্রুতি একটুও হাসলো না—বলল, চিঠিটা শেষ করতে দাও। বলেই চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেই হঠাৎ থেমে গেল। ওর মুখ দেখে মনে হল, ও খুব বিব্রত বোধ করছে, খুব এমবারাসড্ হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, কি হল? পড় শ্রুতি?

শ্রুতি বলল, এলাটা একটা পাগলী মেয়ে। ও আপনার জন্য খুব ভাবে, না রাকেশদা?

রাকেশ বলল, তা ভাবে। এখন ও-ই তো আমার গার্জেন।

অধৈর্য গলায় অর্জুন বলল, পড় না কি লিখেছে তারপর?

শ্রুতি আবার চিঠিটা তুলে নিল বিব্রত হাতে। বলল, লিখেছে—'শ্রুতিমাসী তোমার সঙ্গে রয়েছে, তাই তোমার নিশ্চয়ই কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' তারপর থেমে থেমে পড়তে লাগল—'শ্রুতিমাসী তোমাকে খুব ভালবাসে, আমি জানি। তুমিও শ্রুতিমাসীকে খুব ভালোবাসো—তাই না বাবা? শ্রুতিমাসীকে আমার চেয়ে বেশী ভালোবাসলে কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বাবা।

'আমাদের স্কুলে সেদিন ফেট্ হল। আমি খুব মজা করলাম। এয়ারগানের একটা স্টল ছিল—তাতে যতগুলো প্রাইজ ছিল তার প্রায় অর্ধেক আমি পেয়েছি। একটা সেভিং সেট পেয়েছি। বল বাবা, আমার কি দাড়ি আছে? তাই তুমি এলে তোমাকে দেব বলে রেখে দিয়েছি।'

'আজকে থামলাম। তুমি আমার আব্বা নিও। শ্রুতিমাসীকে আমার হয়ে একটা আব্বা দিও। অর্জুনমেসোকে আমার কথা বোলো। ইতি—তোমার এলাবুড়ি।'

॥দুই॥

অর্জুন আর শ্রুতি বাংলোর হাতার রঙিন ছাতার নীচে বসে ছিল।

আমার সঙ্গে কি একটু একলা থাকা যায় না? অর্জুন বলল।

শ্রুতি বলল, আহা, ন্যাকা, সব সময়েই তো আছি।

আছ, কিন্তু দায়সারা ভাবে।

এ আবার কিরকম কথা?

যেরকম কথা, সেরকম কথা। তোমার রাকেশদা নইলে যেন এক মুহূর্তও চলছে না। কেন? ও বুড়োর মধ্যে কী দেখেছ তুমি?

রাকেশদা মোটেই বুড়ো নয়।

তা তো নিশ্চয়ই এভার ইয়াং। অন্ততঃ তোমার চোখে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার চোখে কেন, সকলেরই চোখে। কাল তো দৌড়ে পারলে না। লজ্জা করে না? সব সময় সিগারেট খাবে, কুঁজো হয়ে বসে থাকবে আর শরীরের উপর যত রকম ভাবে পারো অত্যাচার করবে তো দম হবে কোত্থেকে!

অর্জুন সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ফুঃ! অর্বাচীন একেবারে অর্বাচীন। আরে, শরীরের যত্ন-ফত্ন এযুগে চলে না। যখন বাপ-দাদাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল—অফুরন্ত অবকাশ ছিল,—গোলা-ভরা ধান, পুকুরভরা মাছ ছিল, মানে এক কথায় যখন ভবিষ্যৎ বলে কোনো কথা মানুষের অভিধানে ছিল, তখন এসব শরীরচর্চা-ফর্চা করা মানাত। আজকের দিনে প্রাণেরই কোনো দাম নেই। কাল যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার লাগবে না তুমি জান? ভবিষ্যৎ যখন অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন যা যা করতে চাও প্রাণভরে করে নাও, পরে সুযোগ নাও পেতে পারো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, যেমন আমি। সকালে ৮ টার আগে উঠতে ভালো লাগে না, উঠি না। রাতে আধবোতল হুইস্কি না খেলে ভাল লাগে না, খাই। মোদ্দা কথা, যা ইচ্ছে করে তাই করি। শর্টস পরে থপ্ থপ্ করে তোমার ইয়াং রাকেশদারা সারা জীবন দৌড়ে বেড়াক, ফুসফুসের জোর বাড়াক, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে কেন?

শ্রুতি বলল, থাক, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে পারব না। অন্য কথা বল।

অর্জুন বলল, আমার অন্য কোনো কথা নেই।

তাহলে চুপ করে থাক।

অর্জুন বলল, বেশ রইলাম।

অনেকক্ষণ দু'জনে দুদিকে তাকিয়ে বসে রইল।

শ্রুতি কিছুক্ষণ পরে বলল, ওটা কি গাছ জানো?

জানি না। তুমি কি জানো না যে, আমার বাড়ি বিডন স্ট্রীটে–সেখানেই মানুষ হয়েছি–অত গাছ আমি কি করে চিনব? বাঁদর-হনুমানও নই, আর বটানিও ছিলো না আমার।

শ্রুতি বলল, তোমার স্বভাবটা দিনে দিনে এমন হচ্ছে যে বলার নয়।

অর্জুন বলল, দেখছ একটু আরাম করে রোদে বসে আছি, আমার সঙ্গে এমন ভটর-ভটর করছ কেন? তোমার রাকেশদাকে ডাকো–কোনটা কি গাছ, শুয়োরের লেজ সোজা না হয়ে বেঁকে থাকে কেন ইত্যাদি তাবৎ দুরূহ দুরূহ প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যাবে। যে যা জানে না, তাকে সেই সব প্রশ্ন করে লজ্জা দাও কেন?

এবার শ্রুতি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। বারান্দা পেরিয়ে বাংলোয় ঢুকল। কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর ঘুরঘুর করল। শীতের দুপুরে বাংলোর বড় বড় উঁচু ছাদওয়ালা ঘরগুলোয় ওর ভীষণ একা-একা লাগতে লাগল–শীত শীত করতে লাগল। কুঁজো থেকে গড়িয়ে একগ্লাস জল খেলো, তারপর কুয়োতলার পাশে যেখানে রাকেশ একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে টার্গেট বানিয়ে পয়েন্ট টু টু পিস্তল নিয়ে প্র্যাকটিস করছিল, পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছল।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ ম্যাগাজিনটি খুলে গুলি পুরছিল। মুখ ঘুরিয়ে শ্রুতিকে দেখতে পেয়ে বলল, কি ব্যাপার শ্রুতি? অর্জুন কি ঘুমিয়েছে নাকি?

ঘুমোয়নি–ঐ তো রোদে বসে বই পড়ছে।

ও। বোসো, ঐ কাটা গাছটার উপরে বসো দেখো কেমন মজা।

রাকেশ বাঁ হাতটি পেছনে কোমরের উপরে রেখে বেঁকে দাঁড়িয়ে ডান হাতটি সোজা সামনে তুলে পর পর পাঁচটি গুলি করল–চারটি গুলি বুলস্ আইতে লাগল, অন্যটি বাইরের বৃত্তে।

শ্রুতি বলল, বাঃ, আপনার হাত তো বেশ ভাল।

রাকেশ ম্যাগাজিনটা খুলতে খুলতে বলল, দূর পাগলী মেয়ে–এ কি ভাল মারা হল? যারা পিস্তলে ভাল মারে তাদের মার দেখার মতো। সেবার টোকিওতে ওয়ার্ল্ড শুটিং চ্যাম্পিয়ানশিপে একটি ইতালিয়ান ছেলে এসেছিল–ছোকরা–বেশী হলে বছর কুড়ি বয়স হবে। চোখে সানগ্লাস–একটা লাল নাইলনের গেঞ্জি পরে বসে বসে বিয়ার খাচ্ছিল–র‍্যাপিড শুটিং-এ যেই ওর টার্ম এল, বিয়ারের গ্লাসটি নামিয়ে রেখে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে তিন-চার

সেকেন্ডর মধ্যে সব কটি গুলি ছুঁড়ে আবার এসে বিয়ার খেতে লাগল। মানে কখন হাত তুলল, কখন নামালো টেরই পেলাম না।

গুলিগুলো লাগল? শ্রুতি শুধোল।

লাগল মানে? বুলস্ আইতে কেবল একটি মাত্র ফুটো হলো। একই জায়গা দিয়ে সব ক'টি গুলি কার্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেছিল। ছেলেটি ফার্স্ট হলো।

সত্যি?

সত্যি।

রাকেশদা, আমাকে একবার নিয়ে যাবে দেখাতে? আমার না এসব দেখতে খুব ভাল লাগে। মনে আছে, সেবারে আপনার সঙ্গে মোটরগাড়িতে রেস দেখতে গেছিলাম—উঃ আমার দারুণ লাগে! মাথায় একটা লাল স্কার্ফ জড়িয়ে একটি কনভার্টিবল রেসিং কারে বসে থাকব—আমার পাশে আপনি বসে চালাবেন—আমরা হাওয়ার চেয়ে জোরে চলে যাব, এক এক ল্যাপ্-এ এক এক জনকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে আগে ফিনিশ করব। রাকেশদা, একবার নামুন না। আপনি আর আমি। নামবেন? বলে বড় বড় চোখের পাতা ফেলল শ্রুতি।

BANGLADARSHAN.COM

গুলিভরা ম্যাগাজিনটা পিস্তলের বাঁটে ভরতে ভরতে রাকেশ বলল, দূর, আজকাল আর ওসব দিন নেই। কোনো বিপজ্জনক কিছু করতে যাবার আগেই এলার কথা মনে হয়। আমার যদি কিছু হয় তো এলার কি হবে? ওকে দেখার তো কেউ নেই।

শ্রুতি একটু চুপ করে থেকে বলল, কেউ নেই বলছেন কেন? আপনি ছাড়া এলার কি কেউ নেই?

রাকেশ বলল, কে আছে বল?

আপনি জানেন না কে আছে?

হঠাৎ রাকেশ যেন ভুলে-যাওয়া কিছু মনে করল। ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, তুমি, হ্যাঁ শ্রুতি, তুমি তো আছোই—কিন্তু তোমার নিজের ছেলেমেয়ে হবে, তোমার স্বামী আছে—তুমি তাদের দেখাশোনা করে এলার জন্যে কি কিছু করার সময় পাবে?

শ্রুতির গলায় অভিমানের সুর লাগল। বলল, আপনি কি তাই ভাবেন নাকি? আমার অন্য কাউকে দেখতে হবে বলে আমি এলাকে দেখতে পারব না?

রাকেশ বলল, জানি, আমি তো জানিই—তুমি থাকতে আমার এলার জন্যে কোনো চিন্তা নেই—তবু তোমার উপরে, যে দায়িত্ব তোমার নয়, সে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া আমার অনুচিত।

শ্রুতি বলল, বললেন ভালই, দায়িত্ব যেন কারো ঘাড়ে কেউ ইচ্ছে করে চাপিয়ে দিতে পারে! দায়িত্ব কেউ স্বেচ্ছায় না নিলে কেউ কি তা দিতে পারে?

রাকেশ হাসল, বলল, সে কথা ঠিক। তুমি যা বল সব ঠিক। সত্যি শ্রুতি, কত মেয়েই তো দেখলাম আজ পর্যন্ত–ঠিক তোমার মতো কাউকে দেখলাম না। তারপর একটু চুপ করে থেকে শ্রুতির চোখে চেয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আমার না দেখা হলেই বোধ হয় ভালো হতো। তোমার তো হতোই–হয়তো আমারও ভাল হতো।

শ্রুতি মুখ নিচু করে বলল, নিজের কথা বলুন, অন্য লোকের কি হতো না হতো সে ভাবনা অন্য লোককেই ভাবতে দিন। রাকেশ এবার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে একটি একটি করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। গ্রামের কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে জড়োসড়ো হয়ে রাকেশের পেছনে দাঁড়িয়ে বসে ওর পিস্তল ছোঁড়া দেখতে লাগল।

শ্রুতির এ সবকিছু ভীষণ ভালো লাগে। ওর অনেক কিছু ইচ্ছা ছিল–ও ছেলেদের মতো বাধাবন্ধহীন হবে–টেনিস খেলবে, রোয়িং করবে, কার-রেসে কোনো ছোট্ট খয়েরী রেসিং-কারে একা একা কোনো কৃষ্ণসার হরিণীর মতো ফার্স্ট হবে–কত কি স্বপ্ন দেখত শ্রুতি, কত কি স্বপ্ন দেখত! সেসব স্বপ্ন এক এক করে এখন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। রাকেশদার মধ্যে তবু এখনো সেই সব ভেঙে যাওয়া শীষমহলের স্বপ্নগুলোর টুকরো টুকরো হারের মতো মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠতে দেখে। শ্রুতি বসে বসে ভাবতে লাগল, প্রত্যেকেরই মনে মনে বোধ হয় অনেক স্বপ্ন থাকে–যেসব স্বপ্ন কোনোদিন নিজের জীবনে সত্যি হয় না–কিন্তু তাদের স্বপ্ন অন্যের মধ্যে সত্যি হয়ে দেখা দেয়–জীবনের ধূলিমলিন গেরুয়া একঘেয়েমিতে হঠাৎ হঠাৎ রোদ-পড়া অভ্রর কুচির মতো সেসব স্বপ্ন ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ রাকেশ শুধোল, ছুঁড়বে তুমি শ্রুতি?

শ্রুতি উঠে দাঁড়াল, বাচ্চা মেয়ের মতো খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল, পারব?

নিশ্চয়ই পারবে।

আপনি শিখিয়ে দিলে পারব।

রাকেশ প্রথমে একটি টার্গেট এনে শ্রুতিকে চেনাল। বুলস্ আই, ইনার, ম্যাগ্‌পাই, আউটার। সবগুলি বৃত্ত ওকে চিনিয়ে দিল। তারপর সেফ্‌টি কি করে অপারেট করতে হয় দেখিয়ে দিল। বলল, বাঁ হাতটা পেছনে আনো, এনে এবার ডান হাত সামনে তোলো–ব্যস, এইবার নিশানা করে মারো। ওয়ান–টু–থ্রি!

গুম্ করে গুলি হল। কিন্তু গুলি টার্গেটের কোথাও লাগল না। শ্রুতির চোখ মুখ লাল হয়ে গেল–বলল, আমি পারব না রাকেশদা–আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না। আপনার দামি গুলি আমার জন্যে মিছিমিছি নষ্ট হবে।

রাকেশ বলল, পাগলামি কোরো না। তুমি ঠিকই পারবে। তোমার জন্যে আমার দামি জীবনটাই মিছিমিছি নষ্ট হল—না হয় কিছু গুলিই নষ্ট হবে। তার জন্যে তোমার এত কুণ্ঠা কেন? নাও, এবার ভাল করে মারো। কি হল মারো শ্রুতি! কি হল?

কি হল শ্রুতি তা নিজেও জানে না। বলল, রাকেশদা বিশ্বাস করুন, আমি পারব না, আমার মন বলছে আমি পারব না। সবাই কি সব পারে?

রাকেশ ওর হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে বলল, ঠিক আছে। এখন না হলেও পরে পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।

আমি কোনোদিনই পারব না রাকেশদা। কিছু কিছু জিনিস আছে, যা আমার মনে হয় যে আমি কোনোদিন পারব না।

রাকেশ হাসল। বলল, জানি।

শ্রুতি হাওয়ায়-ওড়া অলক দু'হাতে সরাতে সরাতে অবাক চোখে চেয়ে বলল, জানেন? আপনি জানেন?

রাকেশ আবার হাসল, বলল, জানি।

শ্রুতি কিছু বলল না। মুখ নীচু করে রইল।

BANGLADARSHAN.COM

॥তিন॥

রাত বোধ হয় সাতটাও বাজেনি, অথচ এখানে মনে হচ্ছে কত রাত। শ্রুতি ট্রানজিস্টারটা খুলে গান শুনছিল ঘরে বসে। অর্জুন ইজিচেয়ারে পা তুলে বসে, পাশে হুইস্কির গ্লাস রেখে জেমস্ বন্ডের বই পড়ছিল। রাজুয়াড়ু বাবুর্চিখানায় ছিল। বাইরের বারান্দায় হ্যাচাকটা কাঁটার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। সেটা মাঝে মাঝে আপন মনে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছিল।

আজ বাইরে প্রচণ্ড স্তব্ধ শীত। নির্জনতা ছমছম করছে। দশ-পনেরো বর্গমাইলের মধ্যে জনমানব নেই—এক বাঘমুণ্ডা গ্রামের সামান্য কয়েক ঘর ছাড়া। এইসময় পূর্ণাকোটের পথে গেলে হাতীর দল দেখা যায়। রাকেশ গত রাতে ওদের নিয়ে গেছিল।

ফ্যলকন্ ফোর্ড গাড়ির বন্ধকাঁচ জানালা দিয়ে হাতীদের হাঁটুগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল গাড়িটা থেকে; এমনভাবে ঘিরে ফেলেছিল হাতীগুলো—পাঁচ মিনিট সময় প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কেটেছিল ওদের।

রাকেশ স্টিয়ারিংয়ে ছিল। পাশে তার ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা শোয়ানো ছিল—যদি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লাগে—। কিন্তু হাতীরা কিছু করেনি। আস্তে আস্তে ফিরে গেছিল।

হাতীরা চলে যেতেই অর্জুন রেগে উঠে রাকেশকে বলেছিল—এরকম বাহাদুরি করার মানে হয় না।

রাকেশ মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, কিসের বাহাদুরি, অর্জুন?

এই রকম হাতীর মধ্যে এনে বাহাদুরি!

মানে তোমাদের কাছে বাহাদুরি নেবার জন্যে আমি তোমাদের এখানে আনলাম বলছ?

শ্রুতি তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে বলেছিল, তা নয় রাকেশদা—আমরাই তো আপনাকে বলেছিলাম হাতী দেখাতে!

রাকেশ বলল, হাতী তো দেখলেই।

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ, দেখলামই তো।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন বলল, তা দেখলাম, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বিপদ হতে পারত।

রাকেশ ইঞ্জিন স্টার্ট করে বলেছিল—সে দায়িত্ব আমার উপরে নিয়েই তো আমি তোমাদের এখানে এনেছিলাম অর্জুন। বিপদ তো হয়নি।

শ্রুতি রাকেশের দিকে টেনে বলল, আসলে ও ভীষণ নার্ভাস হয়েগেছিল, তাই এখন উল্টোপাল্টা কথা বলছে।

তখন অর্জুন রাগ-রাগ গলায় বলল, না, আমি নার্ভাস হইনি। আমি কোনো কিছুতেই নার্ভাস হই না। রাকেশ কথা বাড়ায়নি আর। কিন্তু শ্রুতি লজ্জিত আছে তারপর থেকে। অর্জুন আর রাকেশদা তারপর স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা সবই বলছে—তবু যেন অর্জুনের হঠকারিতাটা শ্রুতির মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

হঠাৎ অর্জুন বিরক্ত গলায় বলল, কানের কাছে তোমার ট্রানজিস্টারটা থামাবে?

শ্রুতি অবাক হয়ে বলল, আমি তো আস্তে আস্তে শুনছি।

না। তবুও আমার পড়তে অসুবিধে হচ্ছে।

তুমি তো পড়ছ। আমি তাহলে কি করব?

তা আমি কি জানি? সুব্বল আর রাকেশদার সঙ্গে মাচায় বসতে গেলেই পারতে!

শ্রুতি বলল, কাল থেকে তাই যাব। এমন জায়গায় এসে ঘরে থাকার মানে হয় না।

অর্জুন বলল, বেশ তো। তুমি যাও না। আমি তো বারণ করিনি। বলে একটি সিগারেট জ্বালাল অর্জুন।

শ্রুতি রাগ করে রেডিও বন্ধ করে শালটি ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল। হ্যাজাকের আলোয় বারান্দা ভরে আছে। কিন্তু বাইরের অন্ধকার তাতে যেন আরো ভারী হয়ে রয়েছে। বাইরে কতরকম ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা—একটানা ঝুম-ঝুম, ঝুম-ঝুম-ঝিঁঝির ঝিঁঝির-ঝিঁঝির-ঝিঁঝির। সেখানে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে ভীষণ কান্না পেল শ্রুতির। এ কান্নার কোনো কারণ নেই। একেবারে একা থাকলে মাঝে মাঝে যেমন সকলেরই কাঁদতে ইচ্ছা করে—পুরনো কথা ভেবে কাঁদতে ইচ্ছা করে, নতুন কথা ভেবে কাঁদতে ইচ্ছা করে—পরিণতিহীন ভবিষ্যৎ ভেবে কাঁদতে ইচ্ছা করে,—ওকে সেই কান্নায় পেল। ওর দু'চোখ ছলছল করে উঠল।

ও ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পায়চারি করে ওর উদগত উদাস কান্নার টুকরোগুলিকে একরাশ ঝড়ে-পড়া পলাশের মতো প্রায় মাড়াতে লাগল।

তারপর হঠাৎ ভয়-মেশানো কৌতূহলে ধীরে ধীরে পা বাড়াল শ্রুতি বাইরের অন্ধকারে।

বাংলোয় হাতায় একটি বিরাট আমগাছ। ঝুপরি হয়ে আছে ছায়া। এক এক পা করে সাহসে ভর করে শ্রুতি গেটের কাছ অবধি পৌঁছল। অনেক কষ্টে গেট অবধি। তারপরই ফিরে দাঁড়িয়ে আলো-ঝলমল বাংলোটির দিকে তাকাল। হ্যাজাকের পাশে কতগুলি পোকা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। উপরে চাইল ও—আকাশভরা তারা, কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, ধ্রুবতারা, আরো কতশত তারা, নীরবে নীচের এই নিথর নিষ্কম্প জমাট-বাঁধা অন্ধকার অরণ্যের দিকে চেয়ে আছে। উপর থেকে যে মুহূর্তে চোখ নামালো সে, মুহূর্তে কি এক অজানা অনামা ভয় শ্রুতির শিরদাঁড়া বেয়ে সিরসির করে নেমে গেল। সেই মুহূর্তে শ্রুতির মনে হল, ওর পেছনের বিপুল আদিম অন্ধকাররাশি ওকে সামনের দিকের সামান্য আলোর বৃত্তের দিকে ঠেলছে, সহস্র সহস্র অদৃশ্য শীতল কালো হাতে কারা যেন ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে—শ্রুতির ভীষণ ভয় করতে লাগল, শ্রুতি দৌড়তে দৌড়তে এসে বারান্দায় উঠে পড়ল এবং ঠিক এমন সময় মনে হল সেই ডাকটা শুনল শ্রুতি।

কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। আবার শুনল, কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। সেই তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো অদ্ভুত আওয়াজে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শ্রুতির।

শ্রুতি এক দৌড়ে ঘরে ঢুকেই অর্জুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল তখন যে অর্জুনের গা ঘেঁষে বসে—খুব ইচ্ছে করছিল তখন অর্জুন ওকে একটু আদর করুক।

কিন্তু অর্জুন বলল, আঃ কি হচ্ছে, গ্লাসটা ফেলবে যে! তারপর শ্রুতির ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে বলল, কী হল?

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি বলল, বাঘডুম্বা।

বাঘডুম্বা? সেটা আবার কি জন্তু।

জন্তু নয়, ভূত।

ননসেন্স। কোথায় শুনলে এর নাম?

রাকেশদা বলেছে।

রাকেশদা ছাড়া আর কে এমন আজগুবি ভূতের কথা বলবে!

শ্রুতি বলল, আজগুবি নয়। কালাহাণ্ডিতে, যেখানে প্রায় সব বাঘই মানুষ-খেকো, সেখানে এই ভূত আছে। যে সব মানুষ বাঘের হাতে মারা যায় তারা ভূত হয়ে যায়। ওখানের আদিবাসীরা তাদের বাঘডুম্বা বলে ডাকে। তুমি একটু আগে একটা আওয়াজ শুনলে না?

লক্ষ্য করিনি। আমি তো পড়ছিলাম। কি রকম আওয়াজ?

কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতিকে এমন অদ্ভুত আওয়াজ করতে শুনে অর্জুন হো হো করে হেসে উঠল। নিজে একবার বলল, কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। ফুলে ফুলে হাসতে হাসতে বলল, সত্যি, ধন্য তুমি আর ধন্য তোমার রাকেশদা। আমাকে এখান থেকে যাবার আগে তোমরা পাগল করে ছাড়বে।

শ্রুতি বলল, এতে হাসির কি আছে? তুমি জান, আমি দাদাকে দিয়ে শোনপুরের মহারাজকে লিখিয়ে এ কথা যে সত্যি তা জেনেছি! শোনপুরের মহারাজা বীরপ্রতাপ সিংদেও দাদার বন্ধু।

অর্জুন বলল, তিনি কী বলেছেন? ভূত আছে?

না, তিনি তা বলেননি। বলেছেন যে, স্থানীয় আদিবাসীরা ওরকম যে বলে তা সত্যি।

তবে? আদিবাসীরা বললেই কি বাঘে-মারা মানুষ ভূত হয়ে যাবে? ও নিশ্চয়ই কোনো পেঁচাটেচার ডাক।

শ্রুতি বলল, আমি ওসব জানি না, এইমাত্র আমি ওরকম ডাক শুনলাম বাইরে। এখনো আমার বুকটা কি রকম করছে দেখ।

অর্জুন হুইস্কির গ্লাসটা হাতে তুলে বলল, দেখেছি, বলে চোখ দিয়ে কি একটা বলল শ্রুতিকে।

শ্রুতি বলল, তুমি একটি জংলী। খালি এই সবই জানো।

তারপরে আর কোনো কথা হল না।

শ্রুতি কেবল ভাবতে লাগলো, এই অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের নীচে ঝিঁঝিডাকা, বাঘডুম্বার আওয়াজ-ভরা রাতে, মাচায় নিশ্চল হয়ে বসে থেকে বাঘ কি চিতার জন্যে অপেক্ষা করা না-জানি কেমন অভিজ্ঞতা। খুব ইচ্ছে করে শ্রুতির, একবার সেইও মাচায় বসে। জীবনে এমন অভিজ্ঞতার সুযোগ তো রোজ রোজ আসে না।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে। সেই বিকেলের রমরমে রোদ থাকতে থাকতে একটি সাদা পাঁঠার গলায় দড়ি বেঁধে রাকেশ আর সুব্বল রাইফেল কাঁধে চলে গেছে কুরাপের পথের দিকে। চিতার চলাচলের পথে ওরা নাকি বসবে পাঁঠাটি বেঁধে। কখন ফিরবে ওরা কে জানে! ভাবছে শ্রুতি। বসে বসে নানান কথা ভাবছে শ্রুতি।

এমন সময় পাহাড়-কাঁপানো দূরাগত একটি রাইফেলের আওয়াজের গুম্‌গুমানি বাংলোর ঘরের ভেজানো দরজা পেরিয়ে এসে পৌঁছল।

শ্রুতি বলল, ওরা নিশ্চয়ই কিছু মেরেছে।

অর্জুন বলল, হবে, নতুবা মরেছে।

শ্রুতির চোখের আগুন জ্বলে উঠল। বলল, তার মানে?

মানে আবার কি? বাঘ শিকার কি চাট্টিখানি কথা—ইট্‌স অ্যান অ্যাডভেঞ্চারস্ স্পোর্ট—মারো কিংবা মরো। নইলে এত বাহাদুরি নেয় কেন তোমার রাকেশদারা?

BANGLADARSHAN.COM

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। রাকেশের উঁচু গলা শুনতে পেল। সে বলল, আমগাছের নীচে নামিয়ে রাখ—ওখানে চামড়া ছাড়াব। শ্রুতি আর অর্জুন বারান্দায় বেরিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাংলোর পেছনে এসে দাঁড়াল। দেখল, দুটি পাঁচ-ব্যাটারির টর্চের আলো অন্ধকার চিরে চিরে এদিক ওদিকে লাফিয়ে পড়ছে।

সুব্বল চেঁচিয়ে বলল, দিদিমণি, এতদিনে একটা হল।

শ্রুতি চেঁচিয়ে শুধোল, কি?

ওরা সমস্বরে বলল। কেউ বলল পেণ্ড্রা, কেউ বলল চিতা। প্রকাণ্ড চিতাটিকে এনে হ্যাজাকের আলোয় ওদের জন্যে পাঁচ মিনিট রাখা হল—তারপর আমগাছতলায় নিয়ে রাখল ওরা। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সাদা পাঁঠাটাকে দেখে শ্রুতির খুব আনন্দ হল। তাহলে চিতাটা অবলা জীবটিকে মারার আগেই রাকেশদা চিতাটিকে মেরে ফেলেছে!

হ্যাজাকটা বারে বারে নিভে আসছিল। মাঝে মাঝেই সুব্বল এসে পাম্প করছিল—আলোটা আবার দপদপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। বাংলোর হাতায় প্রচুর লোক ভিড় করে ছিল। এর আগে চেঁচামেচিও প্রচুর হচ্ছিল—এখন একটু চুপচাপ। কেবল মাঝে মাঝে টুকরো-টুকরো কথা, দুর্গা আর গঙ্গাধরের চিতার গায়ে ছুরি চালানোর নরম ফচ্‌ফচ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

চিতাটিকে চিত করে তার বুকের মাঝবরাবর থেকে লম্বালম্বি কেটে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছিল। গোঁফগুলো প্রথমেই হাতে হাতে লোপাট হয়ে গেছে। নখের জন্য ইতিমধ্যেই চারজন প্রার্থনা জানিয়ে গেছে। চর্বি কাউকে দেওয়া হবে না, তা রাকেশ আগেই সকলকে বলে দিয়েছে। চামড়া ছাড়ানোর কাজও প্রায় শেষ। এখন তলপেটের কাজ শেষ করে মাথাটা ভাল করে ছাড়াতে হবে। মাথাটা অর্জুন মাউন্ট করবে বলেছে—মানে ট্রফিটি চেয়েছে রাকেশের কাছ থেকে। রাকেশ কথা দিয়েছে যে দেবে। বাঘ এবং চিতা সে এ পর্যন্ত অনেক মেরেছে—তা ছাড়া মাথা টাঙিয়ে আহ্লাদিত হবার অবস্থা সে অনেককাল আগে পেরিয়ে এসেছে।

অর্জুন সান্যাল চাপা ট্রাউজার ও কালো উরস্টেড ফ্লানেলের লংকোট পরে হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে একটি বেতের চেয়ারে বসে বারান্দা থেকে স্কিনিং করা দেখছে। শ্রুতি মাঝে মাঝে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে রাকেশের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে। তারপর আবার ফিরে আসছে। এক দু'বার বাবুর্চিখানায় গিয়ে তাড়া দিয়ে আসছে। রান্না ঠিকমতো হচ্ছে কিনা দেখছে।

শ্রুতি ফিরে এসে বারান্দায় থামের পাশে দাঁড়াল। হ্যাজাকের আলোর ফালি বাঘমুণ্ডার বাংলোর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা লোকের কাঁপা কাঁপা ছায়া আমগাছটির ডালে-পাতায় লাফালাফি করছে। ঠাণ্ডাটা বেড়েছে বাইরে। লোকজনের ফিসফিসানি কি চামড়া ছাড়ানোর শব্দে কোনোরকমে বিরতি ঘটলেই বাইরের জঙ্গলের একটানা ঝিঁঝির ডাক—ঝি ঝির-ঝি ঝিঁঝির-ঝি কানে আসছে। কেমন যেন ঘুম-ঘুম পায় একটানা ডাকে।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন বলল, আজকের মেনু কি শ্রুতি?

কপির স্যুপ, পরোটা এবং মুরগির মাংস।

ব্য—স? বলল অর্জুন।

শ্রুতি বলল, এতেও হবে না?

তারপর শ্রুতি ওর চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিসে গলায় বলল, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?—জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছ? যে বাঘ মারল, সে তো ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি দেখছি অন্যের বাঘ-মারা সেলিব্রেট করতে বেসামাল হয়ে উঠলে। রাকেশদা কি মনে করবেন বলো তো?

অর্জুন আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলল, আরে রাখ তোমার জংলী রাকেশদার কথা! তোমার রাকেশদার রক্ত গরম। তাছাড়া কে কি মনে করবে তা নিয়ে এ. কে. সান্যাল মাথা ঘামায় না।

শ্রুতি উত্তরে কিছু বলল না। বলল, ঠিক আছে।

শ্রুতি রাকেশের কাছে চলে গেল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে আধো-অন্ধকারে। বলল, রাকেশদা, আর কতক্ষণ লাগবে?

এই তো হয়ে গেল। আর বড়জোর এক ঘণ্টা। মাথাটা আমি নিজে হাতে স্কিন করব। মাংসগুলো ভাল করে স্কুপ্ করে বের না করতে পারলে মাউন্ট করতে অসুবিধে হবে। অর্জুন বলো যে, একেবারে কটক থেকে সোজা ট্রেনে বুক করে দেবে মাদ্রাজে–দিল্লি যাবার দরকার নেই, মাদ্রাজে ওরা ভাল করে।

আমার কতক্ষণ লাগবে জিজ্ঞেস করছিলে কেন? তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? ক্ষিদে পেলে তুমি আর অর্জুন খেয়ে নাও। আমি পরে খাব।

শ্রুতি বলল, না না। আপনি শেষ করে নিন, আমার তাড়া নেই। ওর খেতে ইচ্ছে করলে আগে খেয়ে নেবে।

সে কি? তা কি হয়? ও একা খাবে? তুমিও ওর সঙ্গে বসো–ওকে কম্পানি দিও।

শ্রুতি বলল, সে আমি যা-হয় করব। আপনি এদিকে তাড়াতাড়ি করুন। বাইরে তো রীতিমত শীত–আপনি এই শর্টস পরে আর একটি হাতকাটা সোয়েটার পরে রয়েছেন, শীত করছে না!

রাকেশ শ্রুতির দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি কাছে থাকলে আমাকে কি কোনো দিনও শীতার্ত দেখেছ?

শ্রুতি আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে নিয়ে রাকেশকে বলল, জানি না।

রাকেশ রেমিংটনের ছোরাটা থেকে রক্তমাংস কচি কলাপাতায় মুছতে মুছতে বলল, তুমি জান। তোমার মতো ভাল করে আমিও জানি না। তারপর আরো আস্তে আস্তে বলল, তুমি কাছাকাছি কোথাও থাকলে আমার কোনোদিনই শীত করেনি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি বাধা দিয়ে বলল, থাক্ ওসব কথা।

অর্জুন চীৎকার করে বলল, রাজুয়াড়ু–হুইস্কি–। রাজুয়াড়ু নতুন গ্লাস দিয়ে গেল। হ্যাজাকের আলোতে গ্লাসের ঘোলাটে লাল তরলিমার ভেতর দিয়ে রাকেশ অর্জুনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। ওর মনে হল, এ এক নতুন অর্জুন। অচেনা অর্জুন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতির জন্যে এককণা অনুকম্পা মনে উঁকি মেরে গেল। কিন্তু তা স্থায়ী হল না। তার পরমুহূর্তেই শ্রুতি এবং অর্জুন দু'জনের উপরই এক ঘিনঘিনে ঘৃণা ঘষে ঘষে রাকেশের সমস্ত মহৎ অনুভূতি বাতিল করে বুকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। রাকেশ তার অনুকম্পার অক্টোপাশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, রেমিংটনের ছুরিটা হাতে নিয়ে মৃত চিতাটির মাথার দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে মৃত বাঘের গলায় ছুরিটি আমূল বসিয়ে সেই ঘাতক ঘৃণাটিকে স্থানান্তরিত করল।

গরম সাদা শালটি গায়ে ভাল করে জড়ালো শ্রুতি। তারপর আবার বারান্দায় ফিরে এসে চেয়ারে বসল। বসে বসে উবু-হয়ে-বসা রাকেশকে একরাশ হলুদ আলোয় রক্তাক্ত লাল বাঘের পটভূমিকায় দেখতে লাগল।

সত্যি সত্যিই কেমন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গেছে রাকেশদা। কপালের পাশে চুলে পাক ধরেছে একটু একটু—মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাকে দাঁড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চোখের নীচে কালি পড়েছে বলে মনে হয়। কেমন ক্লান্ত-ক্লান্ত দেখায়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, একদিন রাকেশদাও বুড়ো হয়ে পড়বে। রুমনিদি বেঁচে থাকতে রাকেশদা অন্য রকম ছিল।

যদিও শ্রুতির প্রতি রাকেশ রায়ের বরাবরের দুর্বলতা, কিন্তু তবু রুমনিদি বেঁচে থাকলে সে দুর্বলতা নিয়ে খেলা করা যেত। তার ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভাল লাগত। রাকেশদা যত পাগলামি করত তখন, ও তত দূরে দূরে সরে যেত। মনে মনে বলত, ফাঁকি—সব ফাঁকি।

ওর কাছে রাকেশ ভারী গলায় কোনো আবেগময় কিছু বললে ও সঙ্গে সঙ্গে শুধোত, রুমনিদি এখন কি করছে? তাকে নিয়ে এলেন না কেন? যদি কখনো রাকেশ তার শরীরের কাছে আসার চেষ্টা করত শ্রুতি বলত, আমার হাত ধরতে পারেন—বড় জোর হাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারেন, কিন্তু আর কিছুই নয়।

শ্রুতির মনে পড়ল, একদিন—বোধ হয় সেদিন পয়লা বৈশাখ কি পয়লা জানুয়ারী এরকম কোনো প্রথম দিন ছিল বছরের—রুমনিদির বাড়ি থেকে শ্রুতি ফিরছিল রাতে—রাকেশ ওকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল গাড়ি নিয়ে। যেই গাড়িটি রবীন্দ্রনগর ছাড়িয়ে জোরবাগের রাস্তায় পড়ল, অমনি রাকেশদা বলল, শ্রুতি, আজ বছরের প্রথম দিনে তোমায় আমি আদর করি? শ্রুতি এক ঝট্‌কায় একেবারে জানালার পাশে ছিটকে সরে গেল—বলল, না রাকেশদা, আমার ভালো লাগে না।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, কী ভালো লাগে না?

আমার এসব ভালো লাগে না।

কেন? তুমি কি অপবিত্র হয়ে যাবে? আমার একমাত্র অপরাধ কি এই যে, আমি তোমার রুমনিদির স্বামী? সে পরিচয় ছাড়াও কি আমার অন্য কোনো পরিচয় থাকতে নেই? আমার কোনো অন্তরঙ্গ একান্ত সত্তাও তো থাকতে পারে—যে আমি কারো নই, যে আমি একার, শুধু আমার একান্ত একার—আমার ভালো লাগার, ভালোবাসার—আমার কান্নার কারণ আমি। সেই আমি কি কেউ নই? যেহেতু আমি তোমার পরিচিত কারো স্বামী, সেইজন্যেই কি আমার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাতিল করে ফেলতে হবে? উকিলের সঙ্গে মক্কেলের যে সম্পর্ক, ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর যে সম্পর্ক—আমার সঙ্গে তোমার সেরকম সহজ অথচ গোপন কোনো সম্পর্ক কি থাকতে পারে না শ্রুতি? সব সম্পর্কই কি মন্ত্র পড়ে কি রেজিস্ট্রি করে করতে হয়? সমাজের অনুমোদন ছাড়া কি কাউকে কিছুই দেওয়া যায় না? অন্ধকারে, চোখের জলে কেউ কি কাউকে ভালবাসতে পারে না?

অস্বস্তিভরা গলায় শ্রুতি বলল, অত আমি জানি না, রাকেশদা। আমার এসব ভালো লাগে না। হাত ধরতে পারেন। বড় জোর হাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারেন। কিন্তু আর কিছু নয়। আর কিছুই নয়।

রাকেশ চুপ করে রইল। তারপরও হয়তো শ্রুতির হাত ধরত–হয়তো হাতে অন্যান্য দিনের মতো অবুঝ আবেগে তবুও নির্লজ্জের মতো ঠোঁট ছোঁয়াত–কিন্তু তার আগেই শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে পথে, হয়তো রাকেশের দুর্ভাগ্যেরই প্রতীক হয়ে। শ্রুতি বলল–একটু দাঁড়াবেন। রাকেশ দাঁড়াল। শ্রুতি শর্মিলাকে দরজা খুলে তুলে নিয়ে বলল, চল্, তোকে রাকেশদা নামিয়ে দেবেন। রাকেশের সঙ্গে শর্মিলার আলাপ করিয়ে দিল শ্রুতি। তারপর জোরবেগে একসময় শ্রুতিদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল–শ্রুতি দরজা খুলে নামল। রাকেশকে বলল ও, আপনাকে খুব জ্বালালাম।

রাকেশ মুখে বলেছিল, ঠিক আছে। মনে মনে হয়তো বলেছিল, তুমি তো আমাকে অনুক্ষণই জ্বালাচ্ছ। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল রাকেশ শর্মিলাকে নামিয়ে বাড়ি ফিরবে বলে।

নিজের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রুতি সেদিন হেসেছিল। শীতের দুপুরে সুন্দরী বিড়ালী হতাশ হুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে যেমন ঠাট্টার হাসি হাসে, শ্রুতিও তেমনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল–আয়নায় নিজের সুন্দর মুখ, সুন্দর দাঁত, সুন্দর গ্রীবা দেখতে দেখতে বলল, শখ কত, বাড়িতে স্ত্রী আছে আর উনি আমাকে প্রেম নিবেদন করছেন। চুমুই যদি খাব তো তোমাকে কেন? আমার কি সখার অভাব? কত কত ইয়ং হ্যান্ডসাম ছেলে ঘুরঘুর করছে–ফোন করছে–সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইছে–আমাকে দেখে কবিতা লিখছে–ডেটিং করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে–তারাই আছে আমার চারপাশে ভিড় করে। আমি কি সামান্য মেয়ে নাকি? তারা থাকতে তুমি কেন? তোমায় ভালোবাসার ভবিষ্যৎ কি? শুধু শুধু ভালোবেসে ঠকতে রাজি নয় শ্রুতি–কোনোদিন রাজি ছিল না। আসলে শ্রুতি তখন জানতো না যে, কোনো ভালোবাসারই ভবিষ্যৎ নেই। ভালোবাসা কেবল বর্তমানের–যা কেবল অতীতেই পৌঁছে যায় একদিন–। কারো ভালোবাসারই কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। ভালোবাসার গর্ভে কোনো ভবিষ্যতেরই জন্ম হয় না–ভালোবাসা একমাত্র ভালোবাসাই সৃষ্টি করতে পারে। এক-একটি দুর্লভ মুহূর্ত–এক-একটি সুগন্ধ ক্ষয়িষ্ণু ক্ষণ–যা আর কেঁদে কেঁদেও পরে ফিরে পাওয়া যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

তখন শ্রুতি জানত না যে, সব ইয়ং হ্যান্ডসাম ছেলেরাই একদিন বয়স্ক হয়ে যায়, পুরনো হয়ে যায়–একদিন বহিরঙ্গ হেরে যায় অন্তরঙ্গের কাছে। যে অন্তরের কাছে আছে, থাকে–সে চিরকাল তাই-ই থাকে। কিন্তু যাযাবর যৌবন কোথাও কোনো ঘরে বাসা বেঁধে থাকে না। একদিন ছিল, যেদিন রাকেশদাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে শ্রুতি–তার অবুঝ ভালোবাসা নিয়ে অনেক হেলাফেলা করেছে নিষ্ঠুরের মতো। সেদিন শ্রুতি বুঝতে পারেনি যে, তার ফিগার বরাবরই এমন থাকবে না, তার চাউনিতে বরাবর এত আগুন থাকবে না–তার অস্তিত্ব চিরকালই এমন করে সকলের মনে মনে উষ্ণতার উচ্ছ্বাস বয়ে আনবে না। তখন অনেক কিছু জানতো না শ্রুতি। যা শেখানো হয়েছিল তাই শিখেছিল। শিখেছিল, নারী-শরীরের মতো অমোঘ এবং নিরুপদ্রব পবিত্রতা আর কিছু নেই।

কিন্তু আজকাল রাকেশদাকে দেখলে মায়া হয়। কষ্ট হয়। রুমনিদি মারা যাবার পর থেকে বড় কান্না পায় রাকেশদার জন্যে। কেউ দেখাশোনার পর্যন্ত নেই। অফিস করেন–বাড়ি আসেন। আর বাড়ি বসে কী যে করেন

তা উনিই জানেন। বন্ধু-বান্ধব বলতে কিছু নেই। শখের মধ্যে এই শিকার। তাও খুব কমই আসেন আজকাল। বনে-জঙ্গলে রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়ান। শুধোলে হাসেন। বলেন, এক সোনার হরিণীর প্রেমে পড়েছি।

যেদিন তার অনেক ছিল সেদিন তাকে সহজে হেলা করা যেত, তাকে ছেলেমানুষ আখ্যা দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেত, তাকে পাগল বলা যেত, এমোশনাল বলা যেত–কিন্তু আজ তার যে কিছুই নেই। শুধু তাই নয়–শ্রুতির প্রতি তার মনোভাব সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমন আছে। একটুও বদলায়নি। এইটে ভেবেই আশ্চর্য হয়ে যায় শ্রুতি। এ জগতে এ কী করে সম্ভব হলো? অথচ কীই বা দিয়েছে শ্রুতি তাকে? কিছুই না, কিছুই না–শুধু তিক্ত রিক্ততা ছাড়া কিছুই না। অথচ আজ তার দেবার মতো কিছু নেইও বাকি। রুমনিদি হঠাৎ মেনেন্‌জাইটিসে মারা যাবেন তাই বা কে ভেবেছিল। তিনি অনেকদিন ধরে কোনো বড় অসুখে ভুগলে শ্রুতি হয়ত রাকেশদার এই অবুঝ ভালোবাসার দাম দিতেও পারত একদিন–যদি সে জানত রুমনিদি বরাবর রাকেশদার থাকবে না। তাহলে সে নিজেকে হয়তো রাকেশদার জন্যে প্রস্তুত করতে পারত। ও অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই হলো যে, কিছুই আর করার রইল না। শ্রুতির বিয়ের এক বছর পর হঠাৎ মারা গেল রুমনিদি।

রাকেশদা পাগলামি করে সত্যি, অনেক পাগলামি করেছে শ্রুতির সঙ্গে, কিন্তু রুমনিদির মৃত্যুর পর আর কখনো তেমন পাগলামি করেনি। মুখেও বেশী কথা বলেনি। শুধু চোখে যতটুকু ভালোবাসা দেখানো যায়, তার সর্বস্ব দিয়ে শ্রুতির জন্যে যা করা যায় তাই করেছে–তার বেশী এক কণাও চায়নি। এর চেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যবহার শ্রুতির অভিধানে জানা নেই। কিন্তু আজ তো শ্রুতির হাত-পা বাঁধা। ইচ্ছে করলেও তার আজ উপায় নেই কিছু দেবার।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুনকে সে দেখেশুনেই বিয়ে করেছিল। শর্মিলার বার্থডে-পার্টিতে আলাপ। ওর ফার্স্ট কাজিন। দিল্লির ম্যাককনোলি এন্ড ম্যাকসেমুরে সেলস্-এর নাম্বার টু অর্জুন। নিজের গাড়ি আছে, জোরবাগে ফ্ল্যাট আছে, ভালো চাকরি আছে। তাছাড়া অর্জুনের বয়স অল্প–প্রায় শ্রুতিরই সমবয়সী, সুন্দর চেহারা–দারুণ সৌখীন এবং প্রচণ্ড স্মার্ট–শ্রুতির প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিলো, জাস্ট ইরেজিস্টেবল। তাই বিয়ে করেছিল। সুখী না হবার কোনো কারণ ছিল না। জীবনে সুখী হবার মতো সমস্ত উপকরণই তার ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক–হয়তো সুখী হওয়া হলো না শ্রুতির এ জীবনে।

অর্জুনের জন্যে সে সব কিছু করে–আইনত, বিবেকানুগত ভাবে সে সব কিছু করতে বাধ্য–করেও–কিন্তু রাকেশদার জন্যে সে কিছুই করতে পারে না। সে জানে, তার করা উচিত নয়।

তাই আজকের এই উড়িষ্যার সুগভীর জঙ্গলে, বাঘমুণ্ডার বাংলোয় বসে ঝিঁঝির ঝিঁঝি-রবের পটভূমিতে মৃত বাঘের মুখের সামনে উবু হয়ে বসা অসহায় বিপত্নীক দুর্দম রুক্ষ রাকেশের জন্যে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই শ্রুতির।

হ্যাজাকের আলোয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এল, হঠাৎ যা দেখল তা বিশ্বাস হলো না শ্রুতির। ও চোখ কচলে নিল। তবুও ওর মনে হলো, যে রাকেশদা বাঘের মাথার কাছে ঝুঁকে বসে

আছে–তার মাথার সমস্ত চুল সাদা, দু'হাঁটুর মাঝে তার মাথা নীচু হয়ে ঝুলে পড়েছে, সে রাকেশদা যেন হাতজোড় করে শ্রুতির কাছে কি ভিক্ষা চাইছে। ভিক্ষা চাইছে–যা ও কোনোদিন তাকে দিতে পারবে না–দিতে পারেনি।

॥চার॥

কটক থেকে ফুটুদা বৌদি, শেলী ও মকাকে নিয়ে এসেছিলেন টিকরপাড়ায় উইকএন্ড কাটাতে। সঙ্গে ঢেনকানল থেকে পোড়া পিঠা নিয়ে এসেছিলেন অনেক। ভারী উপাদেয় বস্তু। অর্জুন আর শ্রুতি অনেকগুলো খেল।

বুঝতে পারছে রাকেশ যে অর্জুনের এই বনবাস তেমন ভাল লাগছে না। দিল্লির পার্টি-করা ছেলে–আজ কারো স্ট্যাগ পার্টি, কাল বিয়ার পার্টি, পরশু ককটেল, নইলে কোথাও হৈ-হৈ করা। ওর জীবনটা একটা টপগিয়ারে ফেলা এঞ্জিন হয়ে গেছে। কেবল গতি চায়, একটি বিশেষ বেগের কমে চলতে গেলেই ওর মনের ইঞ্জিন কট্-কট্-কট্-কট্ আওয়াজ করে প্রতিবাদ জানায়।

BANGLADARSHAN.COM

তাতে কোনো দোষ নেই। নিজের যা ভালো লাগে তা যে অন্যেরও ভালো লাগতে হবে এমন কোথা কথা নেই। যে যেমনভাবে আনন্দ পায়। এই দু'দিনের জীবনে আনন্দিত হয়ে বেঁচে থাকলেই হলো।

বাঘমুণ্ডার এই শান্ত নির্লিপ্ত, এখানের সবুজ শালীনতার স্নিগ্ধ আশ্চর্য জীবন, জঙ্গলের জাদু–সব মিলিয়ে রাকেশের নিজের বড় ভালো লাগে। এমন কি বাংলো থেকে না বেরোলেও ভালো লাগে। পুরোনো বাংলোর শার্সিভাঙা ঘরের চৌপাইয়ে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়–কতরকম ফুলের গন্ধ নাকে আসে। বাগানের বড় বড় ডালিয়াগুলোর আড়ালে আড়ালে মৌটুসী পাখিরা দুপুরের রোদে লুকোচুরি খেলে। পাশের সেগুন জঙ্গল থেকে মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার গম্ভীর ডুঙডুঙানি ভেসে আসে। মাঝে মাঝে কোনো প্রোষিতভর্তৃকা কাক মধ্যদুপুরে বাংলোর পেছনের পত্রহীন গাছটার ডালে বসে হাহাকার তোলা গলায় ডাকে খা-খা-কা-খ্বা। দগদগে লাল টাগরায় মুখ হাঁ করে রোদ লাগায়। কুয়োতলা থেকে মাটির কলসীতে জল নিয়ে বাঘমুণ্ডা গ্রামের মেয়েরা ফিরে আসে। এই জংলী প্রকৃতির মতোই তাদের জংলী যৌবন। যেমন টুঙি পাখির শিস্ শুনতে ভাল লাগে, তেমন এদের দেখতেও ভালো লাগে। শুধু দেখতে।

ফুটুদারাও বললেন, রাকেশও বলল যে, যাও তোমরা টিকরপাড়ায় বেড়িয়ে এসো। মহানদীর উপরে চমৎকার ফরেস্ট বাংলো আছে। মহানদীর ঘননীল অথৈ জলে বড় বড় মহাশোল মাছ, শীতের দুপুরের হু-হু-করা হিমেল হাওয়া, সব কিছু ভালো লাগবে। তাই আজ সকালে চলে গেছে অর্জুন আর শ্রুতি, ফিরবে কাল সন্ধ্যেয় ওদের সঙ্গে। মানে, রাকেশ পূর্ণাকোটে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবে।

শ্রুতির আদর-যত্নে এ ক'দিনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল রাকেশ। রুমনি মারা যাবার পর এমন আদর তাকে কেউ করেনি। ইচ্ছে করলে আদর করার লোক জুটত না যে তা নয়—কিন্তু ঐ একরকমের খেয়ালিপনা। নিজেকে কুরে কুরে খেয়ে নিজে বেঁচে থাকাতেই ও বরাবর বিশ্বাস করে এসেছে। নিজের মনের দেরাজের এক-একটি ড্রয়ার খুলেছে—আবার চাবি বন্ধ করেছে—এই মনে মনেই অনবধানে দিনগুলো কেমন করে কেটে গেছে, কেটে যাচ্ছে। মনের ঘর ছেড়ে বাইরের আঙিনায় গিয়ে ও দেখায় সময় পায়নি কি দেখেনি, আর কেউ ওর জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে কিনা।

রুমনির মতো করে রাকেশকে আর কেউ ভালোবাসেনি—বাসতে পারবে না কোনোদিন—এমন কি শ্রুতিও না। রুমনি রাকেশের স্ত্রী ছিল বলে নয়—স্ত্রী তো ঘরে ঘরে সব লোকেরই থাকে, সে এক আশ্চর্য সুরেলা সুগন্ধী মেয়ে ছিল বলে। রুমনির মৃত্যু তার মধ্যের একটি অন্যতম আনন্দের উৎসকে শুকিয়ে দিয়ে গেছে। সে গাছে আর ফুল ফোটে না, পাখি বসে না।

BANGLADARSHAN.COM

যে দু-জায়গায় বাঘের জন্যে মোষ বাঁধা হয়েছে, সে দু জায়গায় মোষের জন্যে জল ও খাবার দিতে গেছে সুব্বল এবং দেখে আসতে গেছে বাঘে মোষ মেরেছে কিনা।

এখন কিছু করার নেই। ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ চুপচাপ পাইপ খেয়েছে। তারপর জামাকাপড় পরেই কম্বলঢাকা বিছানায় শুয়ে পড়েছে রাকেশ।

শুয়ে শুয়ে—চৌপায়ায় শুয়ে শুয়ে রাকেশ ভাবছিল অনেক কথা, পুরোনো কথা—ওর বিয়ের কথা—রুমনির মৃত্যুর কথা, সব ভাবছিল।

রাকেশ ভগবান নয়। মাঝে মাঝেই এই শৈত্য, এই রাতের পর রাত নিঃসঙ্গ নির্জনতা—যা কেবলমাত্র কোনো সৎ শীতল বিপত্নীকের পক্ষেই অনুভব্য—তা অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়, যা করতে ওর রুচি, ওর বিবেক, ওর স্মৃতি ওকে বারণ করে। যার ফলে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কোনোদিন তেমন কিছু করা হয়ে ওঠেনি।

রাকেশের জীবনে গর্ব করার আর কিছু নেই—কেবল এটুকু ছাড়া। সে তার স্ত্রীর স্নিগ্ধ স্মৃতিকে যথার্থ মূল্য দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে।

শ্রুতির প্রতি রাকেশের মনোভাব রুমনির অজানা ছিল না, কিন্তু তা নিয়ে রুমনি কখনো অনুযোগ করেনি। ও হয়তো সেই মুষ্টিমেয়দের একজন, যে বিশ্বাস করত যে কারো ভালোবাসা একজনকে দিয়েই ফুরিয়ে নাও যেতে

পারে, বিশ্বাস করত যে একসঙ্গে কারো পক্ষে দুজনকে ভালোবাসা সম্ভব। সে বিশ্বাস তার না থাকলে রুমনি রাকেশকে তার ক্ষমার ঔদার্যে কৃতজ্ঞ করে যেত না।

ভালোবাসা যে কি তা আজ অবধি রাকেশ জানল না। সে কি শরীর? কোনো শরীরকে একান্ত করে চাইবার বিমুগ্ধ বাসনার আর এক নামই কি ভালোবাসা? ভালোবাসা কি শুধুই শরীর-নির্ভর? শুধু অন্য শরীরে প্রবেশাধিকার পেলেই কি একজনের জাজ্বল্যমান শরীর ও হিমেল হৃদয়ের সব দুঃখ মেটে? ও অনেক ভেবেছে। তা বোধ হয় নয়।

শরীরটাই সব নয়। যাকে ও চায় তার শরীরটাও চায়, কিন্তু যার তার শরীর দিয়ে বিশেষ একজনের শরীরের সান্নিধ্যর স্বাদ মেটে না। তাছাড়া শরীর তো ঝুমঝুমির মতো; দু'দিন বাজালেই পুরনো হয়ে যায়, ললিপপের মতো বেশী খেলেই দাঁত সিরসির করে—শরীরটা নিশ্চয়ই কিছু—কিন্তু কখনোই সবকিছু নয়। শুধু শরীর দিয়ে এই নগ্ন নির্জনতা কখনোই ভরানো যায় না।

রুমনির কথা মনে পড়ে। এইরকম উদাস একলা ভরন্ত সকালে রুমনির কথা মনে পড়ে। কনট প্লেসে ওর জন্যে রুমনি অপেক্ষা করত, রজনীগন্ধার মতো ছিপছিপে রুমনি। দূর থেকে চশমা-নাকে ওকে কেমন ভারিক্কী-ভারিক্কী দিদিমণি-দিদিমণি দেখাত। কিন্তু কাছে এলেই, ওর কাছে গেলেই রুমনি স্বর্ণলতার মতো নুয়ে পড়ত, খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ওকে দেখে মনে হতো রাকেশের ঋজু সত্তা আশ্রয় করে ও বেঁচে থাকবে, বেড়ে উঠবে বলেই যেন এতক্ষণ, এতদিন অপেক্ষা করছিল। আহা, সেই সব দিন! সেই সব দিন! হারিয়ে যাওয়া সেই সব স্বপ্নভরা দিন! স্মৃতিও যেন আজকাল আর তেমন প্রখর নেই। রুমনির মৃত্যু প্রায় চার বছর হয়ে গেলো। এলা তখন সাত বছরের। মুসৌরীর স্কুলে বোর্ডিং-এ দিয়েছে রাকেশ মেয়েকে। রুমনির বড় সাধ ছিল যে ওর জীবনের যা-কিছু অপূর্ণতা অপারগতা সমস্ত এলার মধ্যে সার্থকতা দিয়ে ভরে দেবে। মেয়ের মতো মেয়ে করবে এলাকে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ জানে না, এলা তার মৃতা মায়ের ইচ্ছানুযায়ী ভাল হবে কিনা। ও চেষ্টা করবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু রাকেশ কিছু আশা করে না আর আজকাল। সে অনেকবার আশা করেছিল—নানা রকম আশা। আশা করলেই আশা-ভঙ্গতার দুঃখ বড় কঠিন হয়ে বুকে বাজে।

রুমনি আর নেই সত্যি কথা, আকাশের আশ্বাসে তাকিয়ে ভোরের বাতাসে অনেক অনেক কাঁদলেও সে আর ফিরে আসবে না এও সত্যি কথা—তবু তার ভালোবাসা আছে, বুক ভরে আছে যে ভালোবাসা, মৃত্যুর শেষ দিন অবধি সে বয়ে বেড়াবে। রাকেশের মনে হয়, একবার কাউকে তেমন করে ভালোবাসলে, কারো ভালোবাসা তেমন করে পেলে, সে ভালোবাসা নিশ্চয়ই সারাজীবন থাকে। সাইকেল চড়া একবার শিখে ফেললে কেউ যেমন ইচ্ছে করেও তা ভুলে যেতে পারে না—সত্যিই তেমন করে কাউকে ভালোবেসে ফেললে শত চেষ্টা করেও তাকে আর ভোলা যায় না। যাকে ভালোবাসা যায় সে দূরে যেতে পারে, মরে যেতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা কেউ ভোলে না। তা সব সময় বুকের মধ্যে ঘুঘুর গানের মতো ঘুমিয়ে থাকে। কখনো কোনোদিন এমন একলা উদাস নিরুপদ্রব সকালে তাকে ডাকলেই সে পাশে আসে—যে নেই সে কাছে আসে। যে একবার কাউকে নিরুপায়

ভালবেসেছে কিংবা কারো সত্যি নিখাদ ভালোবাসা পেয়েছে, সে বরাবরের মতো, জীবনের মতো সসঙ্গীই হয়ে থাকে—তাকে একাকীত্বের অসহ্য বেদনা কোনো সময় আর তেমন বিঁধতে পারে না।

এ ক'বছর রাকেশ তো সেই উষ্ণতা দিয়েই, সেই জানাটুকু নিয়েই নিজের মনের অন্তর্বর্তীকালীন শীতল প্রবাহগুলিকে ভরিয়ে রেখেছে।

সুব্বল ফিরে এসে বলল, মোষ দুটি বহাল তবিয়তে আছে, তবে একটি মোষের পঞ্চাশ গজের মধ্যে বাঘ হেঁটে গেছে, কিন্তু মোষকে ধরেনি।

রাকেশ বিছানা ছেড়ে উঠল, রাজুয়াড়ুকে বলল একটু কফি করতে, তারপর ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেলটাকে নিয়ে বাইরে রোদে এসে বসল। নতুন রাইফেল, নতুন মানে নতুন কেনা। আসামের চা-বাগানের জেরী ক্যালানের কাছ থেকে কেনা—কাস্টম বিল্ট এনগ্রেভিং করা সুন্দর রাইফেল—এ দিয়ে নাকি জেরী অনেক হাতী মেরেছে আসামে।

সুব্বল বলল, বাবু, সে গল্বটা মারিবে নি?

এখানে আসা থেকে সুব্বল পেছনে লেগেছে বাইসনটা মারার জন্যে। বাইসনটা গুণ্ডা। পাঁচশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে ওর মাথার উপর। রাকেশ বলেছিল, ওটি মারতে পারলে পুরস্কারের টাকাটা সুব্বলকে দিয়ে দেবে। সে কারণে বেশ কিঞ্চিৎ উৎসাহ থাকলেও, বাইসন শিকারের শখও প্রবল ছিল সুব্বলের। কারণ সে শিকারী। সেই পরিচয়ই ওর কাছে মুখ্য।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশের অনিচ্ছা ছিল না। দিনের বেলার পায়ে হেঁটে গুণ্ডা বাইসন মারার মধ্যে বেশ একটা শিভ্যালরি আছে। একটা ভাল-লাগা আছে। সে বাইসন তিন-তিনজন ফরেস্ট গার্ডকে গাছের সঙ্গে খেঁৎলে দিয়েছে। এমন কি সেদিন পূর্ণাকোটের লোকভরা বাসের পেছনেও সে নাকি শিং উঁচিয়ে তেড়ে গেছিল। কাজেই এ একটা চ্যালেঞ্জ।

শহরে বন্দরের জীবনে আজকাল আর কোনো চ্যালেঞ্জ নেই—আজকাল শিভ্যালরি দেখাবার কোনো পথ নেই। নিজের বোনকে অন্যে অসম্মান করলে বড় জোর একটি আবেদনপত্র নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টের কাছে ছুটতে হবে—পকেট থেকে পিস্তল বের করে সে শুয়োরের মাথা উড়িয়ে দেবার কোনো উপায় নেই। সমাজ বলবে—সেটা বর্বরতা। পিস্তল ছোঁড়াটা বর্বরতা, কিন্তু অসম্মান করাটা কি, তার বিচার হবে জ্বালা নিভে যাবার পর।

যেটুকু শিভ্যালরি ওর এখনও অবশিষ্ট আছে কিংবা ও দেখাতে পারে, এই জঙ্গলে পাহাড়ে এসে রাকেশ দেখায়; নিজেও দেখে। নিজে যে একেবারে ক্লীব হয়ে যায়নি, ঘুষ আর চাকরি রক্ষার বিনিময়ে সবাই যে সবসময় বুকে হেঁটে হেঁটে চলে না, লাথি খেয়ে অপমান সয়ে তবুও যে সকলেই মুখ নীচু করে থাকে না—এইসব মহৎ প্রায়-বিস্মৃত বোধগুলি তার সমস্ত সত্তা ঘিরে আবার ফিরে আসে। মাথার শিরা-উপশিরা দপদপিয়ে বেড়ায়। তাই ও রাইফেল হাতে পায়ে হেঁটে বাঘ-বাইসনের মুখোমুখি হতে ভালোবাসে। মনে মনে বাঘ-বাইসনের অনেকের চেয়ে

বেশী শ্রদ্ধা করে—কারণ ওদের মধ্যে কোন ভণ্ডামি নেই। ওরা সুন্দর, সরল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ওরা মারতে জানে এবং মরতেও জানে। মারবার সমর বাহাদুরি নেয় না কারো কাছে, মরবার সময়ও কাঁদে না কারো কাছে।

॥পাঁচ॥

গাড়িটাকে ডুঙরি পাহাড়ের নীচে একটি পলাশ গাছের ছায়ায় রেখে, লক করে, ওরা পথ ছেড়ে জঙ্গলের সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ল। সুব্বল ভাল করে দেখে নিয়েছিল এখান দিয়ে হাতী চলাচলের কোনো রাস্তা নেই—থাকলে এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যেত না। ওদের ফিরতে ফিরতে রাতও হয়ে যেতে পারে।

সুব্বল রাকেশের দেওয়া একটি খাকি প্যাণ্ট পরেছে—গায়ে একটি খাকি ফুলহাতা শার্ট—উপরে ফুলহাতা সোয়েটার। এবারে দিল্লি থেকে আসার সময় তিব্বতী উদ্বাস্তুদের তৈরী মোটা একটা ছাই-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার নিয়ে এসেছিল রাকেশ সুব্বলের জন্য। সুব্বলের হাতে রাকেশের চার্চিল বন্দুক। কাঁধে একটি ঝোলা। তাতে জলের বোতল, দুটি পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ এবং রেমিংটনের ছোরাটি।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ চাপা গরল ব্যারেথিয়ার ট্রাউজার পরেছে। পায়ে গলফ্-শু। এই পরেই হাঁটতে ভাল লাগে ওর জঙ্গলে। গায়ে একটি জলপাই-সবুজ উঁচুকলারের গরম কাপড়ের ফুলশার্ট। তার উপর চামড়ার জার্কিন—বোতাম সব খোলা আছে। জার্কিনের বুক-পকেটে টোব্যাকোর পাউচ এবং পাইপ দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের পকেটে ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেলের পাঁচ রাউন্ড গুলি আছে। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গুলিগুলো ঝুনুর ঝুনুর করে বাজছে।

রাকেশ দাঁড়িয়ে পড়ে ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা লোড করল, তারপর ডান পকেটে দুটি গুলি রেখে বাঁ পকেটে একটি রাখল। তাতে শব্দটা বন্ধ হলো। টুপিটা কপালের একপাশে ঠেলে দিয়ে রাইফেলটাকে কাঁধে ফেলে সুব্বলের পিছন পিছন রাকেশ হাঁটতে লাগল।

বনে-জঙ্গলে শীতের দুপুরের একটি নিজস্ব নির্জন সৌন্দর্য আছে, যে সৌন্দর্য ভাষায় সহজে প্রকাশ করা যায় না। মিষ্টি মিহি রোদ লতাপাতায় পিছলে পিছলে এসে সমস্ত বনে বনে ছড়িয়ে গেছে। কচি শালপাতায় সে রোদ পড়েছে—তাতে এক আশ্চর্য সবুজাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে—গ্রীষ্মের সকালে স্বচ্ছ জলে চোখ খুলে ডুবসাঁতার দিলে জলের নীচে যেমন সবুজাভা দেখা যায় তেমনি। এখানে ওখানে একটি দুটি রঙীন কাঁচাপোকা বুঁই-বুঁবু-বুঁই-ই-ই-

ই আওয়াজ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঁশঝোপের নীচে নীচে ছাতারে আর বটেরের ঝাঁক খুরখুর খুরখুর করছে। পথ গেছে এঁকেবেঁকে। যেখানে পথ কিছুটা নরম মাটির উপর দিয়ে ঝর্নার উপর দিয়ে গেছে, সেখানে নানারকম জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। একদল শম্বর, একটি বড় এক্‌রা শুয়োর এবং একদল চিতল হরিণীর খুরের দাগ আছে।

টুঙি পাখি মাঝে মাঝে পিটি-টুঙ পিটি-টুঙ করে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোয় ভেসে ভেসে উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের পাহাড়ে কুচিলা গাছের ধনেশ পাখিরা ঝাঁপাঝাঁপি করছিল—তার আওয়াজ কানে আসছে।

এখন প্রায় দুটো বাজে। সুব্বল বলেছে, মাইল তিনেক হেঁটে গেলে বাইসন-চরুয়া মাঠে পৌঁছবে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ বলল, এবার যে মোষ একেবারে ছুঁলই না বাঘে—এ যাত্রায় বাঘ আর মারা হলো না, কি বল সুব্বল?

সুব্বল মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলল, অধৈর্য হবার কিছু হয়নি। আপনারা এখনো পাঁচদিন আছেন। এর মধ্যে বাঘ হয়ে যাবে। বাঘটা প্রকাণ্ড বড়; কমপক্ষে দশ ফিট হবে। হেলাফেলা নয়। বড় বড় মোষ নিয়ে পাহাড়ের উপরে চলে যায়। এ বাঘটা মারতেই হবে। নইলে বাবু দিল্লি থেকে এতদূর এলেন—আমাদের বাঘমুণ্ডার অপমান হয়ে যাবে যে! এ বাঘ আপনাকে মারতেই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, দেখা যাক। সব কপাল।

সুব্বল বলল, হবে হবে। কাল আমি গিয়ে ঠাকুরানীর ঠাঁইয়ে পুজো চড়িয়ে আসব। আপনি দেখবেন, ঠিক হবে।

রাকেশ একটু পিছিয়ে পড়েছিল পাইপটা ভরতে—পাইপটা ভরে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে সুব্বলকে ধরে ফেলল। শুধোল, তুমি এই গুণ্ডা বাইসনটাকে দেখেছ সুব্বল?

হ্যাঁ বাবু।

খুব বড়?

না, খুব বড় না, মাঝারি। কিন্তু দেখলেই রক্ত পানি হয়ে যায়। তার চোখের এমন চাউনি। ভারী পাজি জানোয়ারটা। প্রথমে সাড়া দেয় না—আড়াল নিয়ে লুকিয়ে থাকে—তারপর মওকা বুঝে আক্রমণ করে—আর যখন তেড়ে ছোটে বাবু—তখন দেখলে মনে হয় রেলগাড়ির এঞ্জিন পাগলা হয়ে গেছে।

রাকেশ ওর কথা শুনে হাসল। বলল, রেলগাড়ির এঞ্জিন কোথায় দেখলে?

সুব্বল বলল, কেন? ভদ্রক স্টেশনে? সেখানে আমি যে ছ'মাস কাজ করেছিলাম সে বছরের খরার সময়।

রাকেশ বলল, আমাকে আগে মারতে দেবে। মানে আমি যদি আগে দেখতে পাই। তুমি যদি দেখতে পাও আগে এবং আমাকে দেখাবার সময় পাও তো ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দেবে, যাতে আমি প্রথমে রাইফেল দিয়ে মারতে পারি, নইলে তুমিই আগে মেরে দিও—পরে যা করার আমি করব।

ঠিক আছে। দু' ব্যারেলেই বল পুরে নিয়েছি।

রাকেশ বলল, বেশ করেছ।

পথের বাঁ পাশে কতকগুলো উইয়ের ঢিপি—ভাল্লুকে রাতে এসে একটা ভেঙে দিয়ে উই খেয়ে গেছে। আরো এগিয়ে যেতে পথের উপর অনেকগুলো শজারুর কাঁটা কুড়িয়ে পেল রাকেশ। তিন-চারটি বড় বড় কাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে টুপির ব্যান্ডে গুঁজে রাখল—শ্রুতি ফিরলে দেবে বলে।

এবার ওরা যেন গহন জঙ্গল ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ঘাসের জঙ্গলে প্রবেশ করল। চারিদিকে বড় বড় পাথর—মাঝে মাঝে কেবল ছোট বাঁশ ও সাবাই ঘাসের বন। একদল বগারী পাখি ভরর্-র-র-র-র ভরর্-র-র-র-র করে হাওয়ায়-ওড়া শুকনো পাতার রাশির মতো ঘাসবনের উপরের আকাশে নেচে নেচে চোখের আড়ালের কোন দূরের ধানক্ষেতে উড়ে গেল। রাকেশ সুব্বলের সঙ্গে সেই ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আবার ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করল। সুব্বল বলল, যদি মারা যায় তাহলে চামড়া ছাড়ানো হবে কী করে বাবু! অত ভারী জানোয়ার তো বাঘমুণ্ডায় বয়ে নিয়ে যেতে পঞ্চাশজন লোক লাগবে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, থামো তো তুমি, বাইসনের সঙ্গে দেখা নেই—কী করে চামড়া ছাড়ানো হবে সেই ভাবনায় মরলে।

লজ্জা পেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হাসল সুব্বল।

এমন্ সময় ওদের ডানদিকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরে একটি গভীর নালায় ভারী কোনো জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ শুনল ওরা। মনে হলো কোনো ভারী জানোয়ারের পায়ের চাপে বাঁশ কিংবা শুকনো কাঠ মচমচিয়ে উঠলো।

ওরা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলো, তারপর যেহেতু নালাটি ওদের সমান্তরালে গিয়ে সামনের ঘাস ও বাঁশ বনে পড়েছে, ওরা নিঃশব্দে সোজা এগিয়ে যেতে লাগল—জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথটি ধরে।

কিন্তু সেই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে আর কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলো না ওরা। এদিকে ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

জলের বোতল খুলে রাকেশ একটু জল খেলো। তারপর ফিসফিস করে পরামর্শ করল। ওরা ঠিক করল আরো মাইলখানেক এগিয়ে আবার এই পথেই ফিরবে—নইলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে—এবং সন্ধে হয়ে গেলে এই পথে ফিরতে হবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায়।

সেখানে থেকে প্রায় আধমাইল যাবার পরই পথের মাটিতে বাইসনটির প্রকাণ্ড খুরের দাগ মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল। বাইসন হাতীর মতো যূথবদ্ধ জানোয়ার। কিন্তু এ পথে কেবলমাত্র একটিই বেশ বড় মাপের খুরের দাগ বার বার দেখা যেতে লাগল। কোথাও রাস্তা বরাবর—কোথাও কোণাকোণি রাস্তা পার হবার। কোথাও যাওয়ার—কোথাও আসার। সন্দেহ রইল না যে, এই দাগ গুণ্ডা বাইসনটার!

এদিকে রোদের তেজ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে পাহাড়ে কত শত পোকা-পাখি চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া রবে দিনান্তবেলার বাঁশি বনে বনে দিকে দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। হনুমানগুলো হুপ-হাপ করে এ-গাছ ও-গাছ লাফালাফি করে রাতের বিছানা পাতার আয়োজন করতে লাগল।

ওরা সাবধানে এগিয়ে যেতে লাগল।

পথটা সামনে একটি ঝিরঝিরে ঝর্নার উপর দিয়ে গিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছে। সুব্বল আগে আগে যাচ্ছে। রাকেশের রাইফেলটা কাঁধেই ঝোলানো আছে স্লিং-এ। সুব্বল ঠিক যেই ঝর্নাটার উপরে গিয়ে পৌঁছেছে, এমন সময় পথের ডানদিক থেকে, যে দিকে রাকেশ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—সেদিক থেকে পাথরে-পাহাড়ে খুরে খুরে প্রতিধ্বনি তুলে বাইসনটাকে সুব্বলের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে শুনল ও। বাইসনটা নিশ্চয়ই খুব কাছে এসে পড়েছিল এবং নিশ্চয়ই প্রচণ্ড বেগে আসছিল—নইলে সুব্বলের মতো অভিজ্ঞ শিকারী থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত না।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশের মনে কি এক 'কু' ডাক দিল। ও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল—"সু-ব্বল" সঙ্গে সঙ্গে সুব্বল সংবিৎ ফিরে পেয়ে এক লাফে পেছনে এসে মোটা অশোক গাছের আড়ালে চলে গেল এবং প্রায় তক্ষুনি বাইসনটিকে একটি কালো পাথরের স্তূপের মতো শেষ বিকেলের আলোছায়ায় দেখা গেল। রাকেশ রাইফেল আগেই কাঁধে তুলে তৈরী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। ডান ব্যারেল ফায়ার করার জন্যে সামনের ট্রিগার টেনেছিল, কিন্তু গুলি হলো না। কেবল কট করে আওয়াজ হলো একটি। ভয়ে রাকেশের রক্ত হিম হয়ে গেল। নতুন-কেনা রাইফেল জিরোয়িং না করে এনেছে—এক রাউন্ডও গুলি ছোঁড়েনি আগে, খুব অন্যায় করেছে। কিন্তু কেন এমন হলো বোঝার আগে বাইসনটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার কান দুটি নাড়ালো এবং মাথা নীচু করে সোজা রাকেশের দিকে ঝড়ের মতো তেড়ে এল।

রাকেশ মস্তিষ্কচালিত হয়ে করল কি না জানে না—কারণ ওর মস্তিষ্ক যেন তখন ঠিক কাজ করছিল না—ওর দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছিল যে, একটি গুলিও ফুটবে না—তবু কাছে আসা বাইসনটির ঘাড়ে নিশানা নিয়ে ও পেছনের ট্রিগারটিও টেনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বন-পাহাড় গমগমিয়ে তার ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ গর্জে উঠল এবং যুগপৎ বাঁদিকের অশোক গাছের আড়াল থেকে সুব্বলও বন্দুক দিয়ে গুলি করল। ভরবেগে সামান্য এগিয়ে এসে হুড়মুড় করে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ করে বাইসনটি সামনে পা-মুড়ে পড়ে গেল। বড় বড় শিংওয়ালা মাথাটা পাথরে আছড়ে পড়ল। সুব্বল পাশ থেকে বলে উঠল, আলো বাপ্পালো।

আরো কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাকেশ বাইসনটির কাছে এগিয়ে গেল। সুন্দর সুস্থ প্রচণ্ড প্রাণশক্তিময় কোনো জন্তু মারার পর প্রত্যেকের মনে যে মুহূর্তবাহী বেদনা এসে বাসা বাঁধে সেই বেদনা রাকেশের মনে এসে বাসা বাঁধল। ঝর্নার পাশের ভিজে মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুতে লাগল। একটি একলা ঝিনুকঝিঁঝি হঠাৎ ভুল করে ডেকে উঠল—ঝিঁঝির-ঝিঁ। ঝিঁঝিঁ।

রাকেশ রাইফেলের ব্রিচটি খুলে ডান ব্যারেলের না-ফোটা কার্তুজটি বের করে দেখলো। স্ট্রাইকিং পিনের দাগ আছে—অথচ গুলি ফোটেনি। রাকেশের সন্দেহ হলো তবে বোধ হয় ঐ গুলিটিই খারাপ ছিল। সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্যে রাকেশ ঐ গুলিটি বাঁদিকের ব্যারেলে পুরে একটি মোটা শালগাছের উপরের ডালে নিশানা নিয়ে গুলি করল—গমগমিয়ে উঠল আবার বন-পাহাড়। ডালটিকে করাতের মতো চিরে গেল গুলিটা। রাকেশ বুঝল, গুলির দোষ নয়। স্ট্রাইকিং পিনের দোষ। ডান ব্যারেলের স্ট্রাইকিং পিন ঠিকমতো গুলিতে স্ট্রাইক করছে না। মহা অস্বস্তির কথা। বিপদের সময় লোকে সামনের ট্রিগারই আগে টানে, আর এই রাইফেল শুধু বিপজ্জনক জানোয়ারের উপর ব্যবহার করার সময়েই দরকার। অথচ জেরী ক্যালানের হাতের রাইফেল। এমন কেন হলো বুঝল না রাকেশ।

সুব্বল এগিয়ে এসে শিংটায় হাত দিয়ে দেখল। মাথাটি রীতিমতো ম্যাসিভ। কপালের মাঝে সাদা চাঁদ—পায়ে সাদা লোমের মোজা।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ ভাবছিল, বাঘমুণ্ডায় ফিরে কিছু লোক এনে সকলে মিলে বনে আগুন জ্বেলে রাতে-রাতেই চামড়া ছাড়াতে হবে। চামড়া ছাড়াতে ছাড়াতে রাত কত হবে কে জানে।

টুপিটা মাথা থেকে খুলে একটি উঁচু পাথরের উপরে এলিয়ে বসে পা-দুটি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে রাকেশ পাইপটা ধরালো।

সুব্বল বললে, তোমার জন্যে আমার পাঁচশ টাকা রোজগার হলো বাবু। বলে সে দু-হাত একসঙ্গে করে ওরা যেমন করে প্রণাম করে তেমনি করতে গেল। রাকেশ বাধা দিয়ে বলল, আহা সুব্বল, কি হচ্ছে কি?

সন্ধ্যার সামান্য দেরি ছিল। কিন্তু পশ্চিমদিকে উঁচু পাহাড় থাকাতে সূর্য তার আড়ালে পড়ে গেছিল। তাই ঝর্নাতলায় সন্ধ্যের সায়ান্ধকার নেমে এসেছিল। পাহাড়ের উপর দিয়ে গোলাপী আকাশ দেখা যাচ্ছিল। একসারি ছোটকি ধনেশ কিছুক্ষণ পাখা নাড়িয়ে কিছুক্ষণ ভেসে ভেসে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রাতের আশ্রয়ে ফিরছিল।

কার দুটি অদৃশ্য ঠাণ্ডা হাত আসন্ন রাতের বার্তা বয়ে এনে রাকেশের দু' কাঁধে চেপে বসছিল। শেষ বিকেলে সেই দলতাড়িত বিক্ষুব্ধ বোবা বাইসনের নিথর মৃতদেহটি থেকে একটি নিস্তব্ধ বিষণ্ণ কান্না উঠে সমস্ত বিধুর বনস্থলীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। ময়ূরের কেঁয়া কেঁয়া রবে সেই কান্না অরণ্যে কন্দরে বারে বারে অনুরণিত হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দু'জনে গাড়ির দিকে ফিরে চলল। অনেকখানি পথ যেতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে তখন অন্ধকার। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ এবং পথের এপাশ-ওপাশ দেখে নিতে হচ্ছিল। মাইল দুয়েক হেঁটে প্রায়

গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা দু'জনে। ততক্ষণে গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারপাশ। হঠাৎ রাকেশকে ভীষণ চমকে দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের একটা ঝাঁকড়া শিশু গাছ থেকে কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-কিরি ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ এই রকম একটা আচমকা আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমেই ওরা দু'জনেই চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই সুব্বলের হাত থেকে টর্চটা প্রায় কেড়ে নিয়ে রাকেশ দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে সেই গাছটিতে আলো ফেলল। নিশ্চয়ই কোনো পাখি এমন শব্দ করে—যে শব্দকে রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ মানুষখেকো বাঘে-ভরা কালাহান্ডির জঙ্গলের আদিবাসীরা বাঘডুম্বার ডাক বলে জানে। নাঃ, তন্ন তন্ন করে খুঁজলো গাছটিতে রাকেশ। কোনো পাখি দেখতে পেল না। হয়তো ভিতরের ডালের পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। আর কিছুই শোনা গেল না। চারপাশে কেবল ঝিঁঝি ডাকতে লাগল ঝিঁঝিঁর ঝিঁ—ঝিঁঝিঁর ঝিঁ।

রাকেশ টর্চটা সুব্বলকে ফেরত দিয়ে গাড়ির চাবি খুলে স্টিয়ারিং-এ বসতে বসতে সুব্বলকে শুধোলো—এটা কি পাখি?

ও বলল, জানি না তো?

জানি না মানে? এরকম কোনো পাখির ডাক আগে শোনোনি?

সুব্বল অনেক চিন্তা করে বলল, নাঃ, ঠিক এমনটি তো আর শুনিনি।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ শুধোল, তবে কেমন শুনেছ? এর কাছাকাছি?

সুব্বল জিভ দিয়ে আওয়াজ করল—দুর দুর দুর দুর—দুরগুম দুরগুম।

রাকেশ বলল, দূর, সে তো পেঁচার ডাক।

এবার সুব্বল রাকেশকে উল্টো প্রশ্ন করল—এটা তবে কিসের ডাক?

রাকেশ একবার অন্ধকারে সুব্বলের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ভেবে দেখল সুব্বলকে বাঘডুম্বার কথা বলাটা ঠিক হবে না। ও যদি অন্যদের গল্প করে তবে হয়তো আজ রাতে বাইসনের চামড়া ছাড়াতে আসার লোকই পাওয়া যাবে না। রাকেশ বলল, এও একরকমের পেঁচা। অন্য রকম পেঁচা।

রাকেশের মনে পড়ল, গত বছর নভেম্বর মাসে উড়িষ্যার কালাহাণ্ডির অরাজোর, অরাটাকারি, রামপুর, লেলিগুমা ইত্যাদি গভীর জঙ্গলের আদিবাসীরা রাকেশকে এই বাঘডুম্বার কথা প্রথমে বলেছিল। ওরা বিশ্বাস করে, যে পুরুষ কি নারী বাঘের হাতে নিহত হয় তারা এমনি জঙ্গলে-পাহাড়ে রাতবিরেতে কিরি কিরি কিরি কিরি কিরি, ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ করে গাছ থেকে গাছে গাছে ডেকে বেড়ায়। তাদের অশান্ত আত্মা গভীর বনে বনে কেঁদে কেঁদে নিঃশ্বাস ফেলে।

রাকেশ জানে, ঠিকই জানে যে এ নিশ্চয়ই কোনো অদ্ভুত নিশাচর পাখির ডাক হবে, জিম করবেটের চুরাইলের মতো, যে পাখিরা দিনের বেলায় দেখা দেয় না হয়তো, হয়তো কোনো বড় গাছের মগডালের কোটরে শুয়ে থাকে এরা–যেহেতু তাদের চেহারা কেউ দেখেনি রাতের অন্ধকারে বনে-পাহাড়ে, ওরা এই রকম ব্যাখ্যা করেছে এই ডাকের। কিন্তু রাকেশ আবার ভাবল, অত ভাল করে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটি ফেলে দেখল–পাখিটাকে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। কি কারণে জানে না, এত বছর বনে-জঙ্গলে রাতের পর রাত ঘুরেছে, রাকেশের কোনোদিন এমন হয়নি, জঙ্গলের পথে গাড়ি চালিয়ে বাঘমুণ্ডা যেতে যেতে ওর গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল।

BANGLADARSHAN.COM

॥ছয়॥

মানুষগুলো সব সমান।

সামনাসামনি খালি হাতে লড়ার সাহস নেই। সবসময় আড়াল থেকে লড়ে। মানুষগুলোকে বাঘটা ঘৃণা করে।

সেদিনের কথা বেশ ভাল মনে আছে বাঘটার। গরমের দিন–কোনো তল্লাটে জল নেই–হাতীর দল মহানদীর দিকে চলে গেছে। সারাদিন শুধু আগুনের হল্‌কা আর ধুলোর ঝড়। ধনেশ পাখিগুলো সারাদিন পাহাড়ের মাথায় কোনো গাছে একটু ছায়া খুঁজে মাথা গুঁজে বড় বড় হাঁ করে করে নিঃশ্বাস ফেলেছে। চিতল হরিণগুলো দল বেঁধে শুকনো মুখে কোনো গভীর নালার ছায়ায় শুয়োরের দলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে সমস্ত দুপুর বসে থেকেছে আর ঝিমিয়েছে!

সন্ধে হবে হবে–দিনের শেষ ময়ূরের ডাক শোনা গেছে, বাঘটা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে ডুঙরি পাহাড়ের পাশের নালার দিকে এক-পা এক-পা করে সাবধানে এগোচ্ছিল। এখনো ভাল করে পা ফেলা যাচ্ছিল না–পাথর মাটি সব আগুনের মতো তেতে আছে। টিলাটা পেরোলেই বাঘটা জল দেখতে পেল। একটুখানি জল, লাল কাদার মাঝে মাঝে জমে রয়েছে। কতকগুলি ঝিনুক-ঝিঁঝি জলে জলছড়া দিয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে যাচ্ছে। একটু আগে বোধ

হয় একটা বাইসন জলে নেমেছিল। তার গাব্দা-গোব্দা পায়ের গর্ত এখনো কাদায় অটুট আছে। জল চুঁইয়ে পড়ছে তাতে।

বাঘটা গুঁড়ি মেরে বসে চারদিক দেখে নিল, তারপর জলে নেমে এল। নেমে এসে চক্-চক্-চক্-চক্ করে মাথা নীচু করে জল খেতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে একটা বাজপড়ার মতো আওয়াজ হলো, আর কি একটা জিনিস হঠাৎ তার মাথা থেকে দু'হাত দূরে একটি পাথরের চাঁইয়ে এসে লাগল। এক টুকরো পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে জলে ছিটকে এসে পড়ল। বাঘটার তৃষ্ণা নিবল না। ভীষণ অবাক হয়ে ও একলাফে আবার পেছনের দিকে ঢুকে গেল—বেশ অনেকখানি এসে, টিলাটির উপরে কিছুক্ষণ আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাল করে নজর করে দেখল, জলের পাশে একটি গাছ থেকে দুটি মানুষ নেমে এল—অদ্ভুত পোশাক পরা, এমন পোশাক এই বাঘমুণ্ডা, কুরাপ, টুল্বকা, পূর্ণাকোট টিকরপাড়ার কোনো লোককে সে পরতে দেখেনি। তাদের হাতে লাঠির মতো কি দুটি চকচকে জিনিস। তারপর তারা ফিরে গেল।

সেদিন থেকে বাঘটা মানুষদের ঘৃণা করে—বিশেষ করে অমন পোশাক পরা এবং হাতে ঐরকম চক্চকে লাঠি নেওয়া মানুষদের।

বাঘটা গুহার বাইরে সামনে দু'থাবা ছড়িয়ে বসেছিল। শীতের সূর্য একটু পরে অস্ত যাবে। পাহাড়ের উপরের গুহা থেকে বাঘমুণ্ডা গ্রামটা দেখা যায়। পোকার মতো লোকগুলো ঘুরঘুর করে। মাঝে মাঝে ধুলো উড়িয়ে জঙ্গলের কনট্রাকটরের ট্রাক আসে—ফটাং ফটাং আওয়াজ করে বাঁশ না কাঠ লাদাই করে—তারপর ফিরে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এখন শেষ বিকেল। এখন ওসব কোনো শব্দটব্দ নেই। মাঝে মাঝে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে।—ময়ূর ডাকছে ডুঙরি পাহাড়ের দিক থেকে। পশ্চিমের দিকের জঙ্গল পাহাড় কেমন বাঘিনীর পায়ের মতো নরম সোনালী আলোর বালাপোষে মুড়ে রয়েছে। এমন সব মুহূর্তে বাঘটার ভীষণ একা একা লাগে। ন'মাসে ছ'মাসে কোনো বাঘিনীর সঙ্গে দেখা হয়—বাঘটা বাঘিনীদের বয়স জানে না। বাঘিনীদের কোনো বয়স হয় না—বাঘটার কাছে কোনো বাঘিনী আসে—কিছুদিন থাকে—বনে-পাহাড়ে, চাঁদনী রাতে নদীর বালিতে, নরম সবুজ ঘাসে ওরা দু'জনে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়ায়—বাঘিনীকে দেখিয়ে দেখিয়ে চিতল হরিণীর নরম গ্রীবা থাবার একঘায়ে ভেঙে দেয়—। এমনি করে দেখে ও দেখিয়ে, দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে যায়। তারপর তার তলপেটের সমস্ত উত্তাপ, তার গায়ের গন্ধ, তার হাতের জোর, তার চোখের আগুন সব চুরি করে নিয়ে একদিন বাঘিনীটা পালিয়ে যায়—কিন্তু আসলে পালাতে পারে না। বাঘটা বাঘিনীর শরীরে, মনে, অণুতে অণুতে ছড়িয়ে থাকে—তার নাভিমূলের সঙ্গে ঝুলতে থাকে—তার রক্তের সঙ্গে দৌড়তে থাকে। বাঘটা বাঘিনীর শরীরময় অনেকগুলো বাঘ হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তারপর একদিন কোনো গহন গাছের ছায়ায় অথবা কোনো গভীর গুহায় বাঘটা কতকগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে নরম ডোরাকাটা শরীরে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু এই বেঁচে থাকা—মনে-মনেই বেঁচে থাকা। এ জীবনে বেঁচে থাকা নয়। বাঘটার বড় একলা লাগে। দিনের পর দিন বাঘটা একা থাকে, মাসের পর মাস। ক্ষিদে পায়, ক্ষিদে মেটানোর জন্যে শিকার ধরে, ধারালো দাঁতে মাংস

চিবোয়–রক্ত চোষে–পেট আই-ঢাই করে, জল খায়, তারপর চার-পা তুলে তলপেটে রোদ লাগিয়ে আরামে শীতের দুপুরে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু বাঘটার মন কেমন করে। বাঘটাকে দেখে বনের পশু-পাখি পথ ছেড়ে দেয়–ভয়ে পালায়–বাঘটা বনের রাজা–অথচ তবু বাঘটার সবসময় হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে আড়ালে আড়ালে চোরের মত গিয়ে তার প্রজাদের কাছে পৌঁছতে হয়। অন্য রাজারা প্রজাদের মঙ্গল করে–বাঘটা তার প্রজাদের বিনাশ করে। বাঘটার ভাল লাগে না। মোটেই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে বাঘটার পাহাড়ের চুড়ো থেকে নীচের পাথরভরা নদীতে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থাকলে বাঘের বাচ্চার মতো বাঁচতে হয়, খালি পেট ভরাবার জন্য, খিদে পেলে খাবার জন্যে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না, বাঘটা ভাবে। মাঝে মাঝে বাঘটার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

কী যেন সেই লাইনটা, শ্রুতি, তোমাদের রবীন্দ্রনাথের? শ্রুতির পাশে হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন বলল।

রাকেশ বলল, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ মানে?

মানে আমার কলেজের এক কবি বন্ধু ছিল–সে শিখিয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত না হলে জীবনে কিছুই করা যাবে না। ও বলত, সবসময় বলবি 'তোমাদের রবীন্দ্রনাথ', নইলে 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথের উপর দুর্বলতা জন্মে যাবে। আমি সেকথা বরাবর মেনে চলেছি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত যে হয়েছ এ তোমার বড় শত্রুও স্বীকার করবে। কিন্তু অন্য কোনো কবির লেখা কি পড়েছ?

অর্জুন বলল, না। টাইম পাইনি। ভাগ্যিস পাইনি। কবিতা পড়ে যে কি হয় তার দু'একটি দৃষ্টান্ত আমার দেখা আছে। যাক্ আসল কথাটা ভুলে যাচ্ছি, কী যেন লাইনটা শ্রুতি–?

শ্রুতি বলল, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

অর্জুন বলে উঠল, ও লালা,–ও লালা। জব্বর লাইন। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'–আমিও মরতে চাই না। তোমরা কেউ মরতে চাও? শ্রুতি, রাকেশদা?

শ্রুতি বলল, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচতে চাই–মরবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মনে হয় জীবনে এখনো কত কিছু করা হলো না, দেখা হলো না, শোনা হলো না, এর মধ্যে মরা কি করব? রাকেশদা আপনার মরতে ইচ্ছে হয়?

রাকেশ বলল, আমার সবসময় মরতে ইচ্ছে হয়। এটা কোনো বাহাদুরির কিছু নয়–কিন্তু যখনি ভাবি যে বেঁচে থাকলে মানুষের মতো, সত্যিকারের মানুষের মতো বাঁচা উচিত, মানুষের মতো কিছু করা উচিত, নইলে বেঁচে যে থাকতেই হবে–রোজগার করতেই হবে, পেট ভরাতেই হবে, দুপুরে অফিস যেতেই হবে, রাতে খাবার পর মশারি ফেলে ঘুমিয়ে পড়তেই হবে–এই সব নিয়মগুলো যে মানতেই হবে–দিনের পর দিন, প্রতিদিন, বছরের

পর বছর, যুগের পর যুগ–এটা ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। বাঁচার মতো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা না থাকলে, আমার মনে হয় মিছিমিছি এই ওভার-পপুলেটেড পৃথিবীতে ভিড় না বাড়ানোই ভাল। সত্যি-সত্যিই আমার খুব মরতে যেতে ইচ্ছে করে।

অর্জুন বলল, ইচ্ছার জোরে কি না হয়? আপনি জীবনে যা যা পেয়েছেন সবই তো ইচ্ছা করেছিলেন বলেই? তবে ইচ্ছা করলে মরতেও পারেন।

রাকেশ হঠাৎ একটু আহত এবং অবাক মুখে অর্জুনের দিকে চাইল। শ্রুতি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, তারপরই চোখে আগুন হেনে অর্জুনের দিকে মুখ ফেরায়।

অর্জুন একটুও না ঘাবড়ে বলল, কি বলুন রাকেশদা, ভুল বলেছি?

রাকেশ বলল, না। ঠিকই বলেছ। ইচ্ছা করলে মরাও যায়।

তবে? বলে, উটকো হাসি হাসল অর্জুন।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাংলো থেকে অনেক দূর চলে এসেছিল–আলোও প্রায় পড়ে এসেছে।

অর্জুন বলল, চলুন, এবার ফেরা যাক। যা জংলী জায়গা।

BANGLADARSHAN.COM

চল। রাকেশ বলল।

শ্রুতি বলল, না, এখন ফিরব না–আরো কিছুটা সামনে যাব। আমার হাঁটতে খুব ভাল লাগছে।

অর্জুন বলল, তবে তুমি যাও রাকেশদার সঙ্গে–আমি ফিরছি।

শ্রুতি বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাও–সূর্য তো ডুবে গেল–তোমার বন্ধু অপেক্ষা করছে।

অর্জুন অবাক। বলল, কে বন্ধু?

শ্রুতি সামনে চলতে চলতে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, হুইস্কি।

অর্জুন একা একা বাংলোয় ফিরে আসতে লাগল। ও হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা ভাবতে লাগল–ভাবতে ভাবতে ওর চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে এল–মনে হলো শক্ত হয়ে মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, মুখ থেকে খুলে পড়ে যাবে। অর্জুন একবার ডান হাতের তেলো দিয়ে ওর চোয়ালে হাত বোলাল। একটা নিষ্ঠুর নিস্তব্ধ হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে গেল।

একটি নেকড়ে বাঘ, দৌঁড়ে পথের ডানদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকল। অর্জুন ভয় পেল। বাকি পথটা ও দৌড়তে দৌড়তে এসে বাঘমুণ্ডার বাংলোয় পৌঁছল।

শ্রুতি সামনে সামনে হাঁটছিল—রাকেশ পেছন পেছন।

রাকেশ বলল, আর এগিও না শ্রুতি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে, সঙ্গে টর্চ নেই।

শ্রুতি বলল, না থাকল—অন্ধকার হলেও পথ তো দেখা যাবে।

তা যাবে—একটি আবছা সাদা শাড়ির মতো দেখাবে—মনে হবে দু'পাশের অন্ধকারের মধ্যে বিছানো আছে।

ওরা দু'জনে কেউ আর কোনো কথা বলল না। দু'জনে পাশাপাশি আসন্ন সন্ধ্যায় বিষণ্ণতামাখা বনে হাঁটতে লাগল।

এমন সব মুহূর্ত প্রত্যেকের জীবনেই আসে যখন মোটে কথা বলতে ইচ্ছে করা না, বরং সমস্ত জীবনে যে এত কথা, এত অবান্তর কথা বলে এসেছে তার জন্যে নিজের উপর অনুশোচনা হয়।

ওরা দু'জনে দু'জনের কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল। ওদের চেতনার ক্যানভাসে নানারঙা জলরঙ খুশীর তুলিতে বুলিয়ে বুলিয়ে ওরা দু'জনে আলাদা আলাদা ছবি আঁকতে লাগল। অথচ ওরা দু'জনেই মনে মনে জানে যে, ছবি আঁকা হয়ে গেলেই ম্যাজিক শ্লেটের ছবির মতো সে ছবি মুছে যাবে—একে অন্যের ছবি দেখতে পারবে না, অন্যকে নিজের ছবি দেখাতে তো পারবেই না। অথচ তবু ওরা দু'জনে মনে মনে রঙিন ছবি এঁকে চলল।

BANGLADARSHAN.COM

দেখতে দেখতে রোদের লালিমা কখন মুছে গেল—শীতের বন থেকে একটি সোঁদা সোঁদা ঠাণ্ডা ভাব উঠতে লাগল—সমস্ত বনস্থলী রাতের নাটকের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

রাকেশ ডাকল, শ্রুতি!

উঁ!

ফিরবে না?

শ্রুতি উত্তর দিল না। চুপ করে চলতে লাগল।

হঠাৎ বলল, আচ্ছা রাকেশদা, সায়ান্ধকার পথে এরকম হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিন ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া যায় না? জাস্ট ফেড আউট করে যাওয়া যায় না? আমার ভারী ইচ্ছে করে আমার কোনো ভীষণ সুখের মুহূর্তে এমন সুন্দর কোনো পথে হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিন আমি জাস্ট ফেড-আউট করে যাব। তারপর আমাকে কেউ ডাকলেও আমি ফিরব না—আমি নিজে—ডাকলেও আমি আর সাড়া দেব না। অথচ আমি আমার চারপাশের অন্ধকারেই ছড়িয়ে থাকব—ঝিঁঝির ডাক হয়ে থাকব, জোনাকি হয়ে থাকব—তারার আলোয় দ্যুতিমান শিশিরবিন্দু হয়ে থাকব, ঝরাপাতা হয়ে থাকব—অথচ শরীরে—এই স্থূল রক্তমাংসের শরীরে আমি থাকব না। বেশ হয় তাহলে। না?

রাকেশ কোনো উত্তর দিল না।

ওরা বাংলোর দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগল। শ্রুতি বলল, কি? কথা বলছেন না যে?

রাকেশ হাসল, বলল, এই জন্যেই বলি মেয়েদের কখনো বেশী লেখাপড়া করা উচিত নয়! মাঝে মাঝে কি যে সব ভুতুড়ে ভুতুড়ে কথা বল, বুঝতে পারি না।

শ্রুতি ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, সত্যিই পারেন না।

সত্যিই পারি না।

তাহলে বুঝতে হবে আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার কম আছে।

রাকেশ দাঁড়িয়ে পড়ে পাইপটা ধরাল, তারপর হাসল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

অন্ধকার হয়ে গেছিল। ওরা হাঁটছিল–। বাংলো এখনো প্রায় তিন ফার্লং মতো হবে।

শ্রুতি বলল, এদিকে যদি হাতী চলে আসে?

না, এদিকে আসবে না।

BANGLADARSHAN.COM

ইস্, আপনি সব জানেন! যেন আপনার পোষা হাতী? সব আপনার কথা শোনে!

তা তো বলিনি।

তবে?

মানে এদিকে কোনোদিন আসার চিহ্ন পাইনি–তবে এসে পড়তে পারে–বিশ্বাস নেই। রাকেশ বলল।

অন্ধকার করা উচিত হয়নি আমাদের।

আমরা যা কিছু করি সবই কি করা উচিত?

তুমি আজ উকিলের মতো কথা বলছ শ্রুতি, তোমার সঙ্গে কথায় পারব না।

পারবেন তো নাই-ই–বলেই হঠাৎ শ্রুতি চেঁচিয়ে উঠল উঃ বাবা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পথের ধুলোয় পড়ে গেল। একটি কাঠের কালভার্টের উপর দিয়ে ওরা যাচ্ছিল–নতুন কাঠের স্লিপার উঁচু হয়ে ছিল। তাতে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে শ্রুতি পড়ে গেল।

রাকেশ দৌড়ে গিয়ে ওকে হাত ধরে তুলল। বলল, খুব লেগেছে?

শ্রুতি বলল, উঃ!

ঠিক হয়েছে। আরো ঝগড়া কর। ভগবান বলে কি কিছুই নেই?

শ্রুতি বলল, উঃ বাবা। আছে আছে। বড্ড লেগেছে।

এসো—এটুকু রাস্তা আমার হাত ধরে চলো।

হাত ধরে?

হ্যাঁ। হাত ধরে চলো, তা নইলে আবার কোথাও পড়ে হাত-পা ভাঙবে, তারপর অর্জুনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমায়।

শ্রুতি বলল, ঠিক আছে। তাই চলুন।

কিছুটা পথ ওরা দু'জনে চুপচাপ হাঁটল অন্ধকারে। হাত ধরে।

হঠাৎ শ্রুতি বলল, দারুণ গেয়েছেন গানটা, না? প্রতিমা ব্যানার্জী?

রাকেশ বলল, কোন্ গান?

"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ জানি না।"

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, দারুণ! বলেই চুপ করে গেল।

আর কিছুদূর যেতেই ওরা বাংলোর হাজাকের আলোর আভা দেখতে পেলো।

রাকেশের হাত ধরে শ্রুতি হাঁটতে লাগল। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে বেড়াতে গেলে যেমন আশ্বস্ত লাগত, নির্ভয় লাগত, ভাবনাহীন মনে হতো, রাকেশের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বহুদিন পর শ্রুতির ঠিক তেমনি মনে হতে লাগল।

রাকেশ বলল, জোরহাটের কথা মনে আছে শ্রুতি?

শ্রুতি বলল, আছে। আমি, আপনি, ধীরেনদা, রামুকাকা, বাবা সবাই গেছিলাম ওখান থেকে কাজীরাঙ্গার গণ্ডার দেখতে—মনে আছে।

রাকেশ বলল, আমি সেকথা বলছি না। সেই জোরহাটের সার্কিট-হাউস থেকে আমরা বিকেলে বেরিয়ে তোমাদের যেন কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলাম। সেখানে কত কি কথা হল, গোলাপী লণ্ঠনের আলোয়—আমার সেসব কিছু মনে নেই—তোমার সেই দূর-সম্পর্কের মামা না কে, কার যেন নিন্দা করলেন। তারপর ফেরার পথে সেই নির্জন রাস্তা দিয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম—সুন্দর চাঁদ উঠেছিল, হাওয়ায় হাওয়ায় সজনে গাছের পাতা ঝরছিল—মনে আছে?

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে–গরমের দিন ছিল, তাই না?

রাকেশ বলল, মনে আছে? তুমি জেদ ধরলে, আমি রাকেশদার হাত ধরেই যাব–আর কারো হাত ধরব না। সে কথা শুনে ধীরেন বলল–দূর পেত্নী, তোর হাত কে ধরবে রে? সবসময় ঘামে।

শ্রুতি হো হো করে হেসে উঠল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। বলল, আচ্ছা, তারপর ধীরেনদা গান গাইল না?

রাকেশ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি যেন গানটা?

দাঁড়ান দাঁড়ান, মনে করছি–ঐ যে ঐ–"চোখের জলে লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।"

রাকেশ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ গেয়েছিল গানটা। এখনো মনে আছে। মনে লেগে আছে।

শ্রুতি বাঁ হাত নেড়ে বলল, বাবাঃ সে কি টপ্পার কাজ। স্বর যত কাঁপে, ঘাড় তার চেয়েও বেশী কাঁপে।

রাকেশ হাসতে হাসতে বলল, তুমি খালি ওর পেছনে লাগতে। আসলে গাইত ও ভালোই।

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ। আপনারই মতো।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর কিছুক্ষণ ওরা আবার চুপচাপ হাঁটল।

শ্রুতি বলল, তখন আমি কত ছোট ছিলাম, না?

এখনও আছ।

তখন আমার একটা হাইল্যান্ডারস স্কার্ট ছিল–মনে আছে? লাল সবুজ আর হলদে, খোপ্ খোপ্–ইস্, এখনো মাঝে মাঝে স্কার্টটার স্বপ্ন দেখি। বেশ ছিল ছোটবেলার দিনগুলো, না রাকেশদা? আমার সেই স্কার্টটার মতো!

রাকেশ কোনো উত্তর দিল না, মাথা নাড়ল।

বাংলোর কাঠের গেটটা খুলে একপাশে দাঁড়াল। শ্রুতি ঢুকলে, নিজে ঢুকে, গেটটি আবার টেনে দিল।

॥সাত॥

অর্জুন চান করছিল। জানালার তাকে একটি গেলাসে জিন এন্ড লাইম রেখে চান করছিল। সাবান মাখছিল–জল ঢালছিল গায়ে–মাঝে মাঝে গেলাস থেকে চুমুক দিচ্ছিল। বাথরুমের জানালা দিয়ে ঝুপ্‌রি আমগাছটা দেখা যাচ্ছিল। কতগুলো পাখি পাতায় ডালে হুড়োহুড়ি করছিল।

শ্রুতি চান সেরে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিল। চুল খুলে। বাথরুমে শ্রুতির ছাড়া-কাপড়জামা এক কোণে জড়ো করা ছিল। সকালে পরা শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, ভেতরের জামা–সব। অর্জুন শ্রুতির শাড়িটা তুলে নিয়ে নিজের সাবান মাখা শরীরে পরল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই বলল, splendid; তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, বাঃ, Nothing for nothing; And damn all for six pence.

নিজেই বলল, বেশ দেখাচ্ছে তো–'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়ার'–পিটার ওটুলের মতো–।

তারপর অর্জুন শাড়িটা খুলে ফেলে ভাল করে চান করল। সাবানের ফেনা নিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল নালা বেয়ে। সেদিকে চেয়ে ছিল অর্জুন। সাদা সাদা সরের মতো ফেনা, মাকড়শার সাদা জালের মতো ফেনা, বয়ে যাচ্ছিল নালা বেয়ে–একটানা মিষ্টি শব্দে বাইরে পড়ছিল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অর্জুনের মনে হলো–রাকেশ রায়কে ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে–This chap thinks that he is too smart. কিন্তু যাই হোক, শ্রুতি তার বিবাহিতা স্ত্রী। সেও কিছু ফেল্‌না ছেলে নয়। শ্রুতিকে বিয়ে করে সে শ্রুতিকে ধন্য করা ছাড়া অধন্য করেনি। তা সত্ত্বেও What's all these? রাকেশ কী মনে করে অর্জুন ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? অর্জুন ভাল করে শিখিয়ে দেবে রাকেশ রায়কে কত ধানে কত চাল। কিন্তু কী করে শেখাবে? তার এই নিষ্ফল ক্রোধকে সে কী করে চরিতার্থ করবে?

BANGLADARSHAN.COM

ওসব ভালোবাসা-টালোবাসা বাংলা ছবিতে চলে। জীবনে ওসব চলে না? এখানে শুধু হিসেব। হিসেব ছাড়া আর কিছু নয়। এ ডেবিট মাস্ট অলওয়েজ হ্যাভ এ ক্রেডিট। বিয়ে করলে আমাকে–আর প্রেম দেখাবে রাকেশ রায়কে, ওসব অর্জুনের মাথায় আসে না। অর্জুনের মনে হয় আজকাল, সব সময় মনে হয় যে, শ্রুতির সঙ্গে রাকেশের একটা গভীর অ্যাফেয়ার আছে। সে অ্যাফেয়ার ঠিক ব্যাখ্যা করার মতো নয় এবং অর্জুন কক্ষনো শ্রুতিকে যা-খুশী তাই করতে দেবে না। She just can't have the cake and eat it as well.

কি করা যায়–কি করা যায়? অর্জুন খুব ভাবতে লাগল। ভেবে ভেবে যখন মাথায় কিছু এলো না–তখন এক ঢোকে জিনের গেলাসটি শেষ করে ফেলল। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জামাকাপড় পরে বারান্দায় এসে আর এক গ্লাস গিমলেট নিয়ে বসল অর্জুন। শ্রুতি কিছু বলল না, একবার তাকাল শুধু ওর দিকে। বিরক্তি নয়, উদাসীনতার চোখে।

চারিদিকে চাইল অর্জুন। চতুর্দিকে খালি জঙ্গল আর জঙ্গল–পাহাড় আর পাহাড়–একঘেয়ে–ড্র্যাব, মনোটনাস্।

সকালে ঘুম থেকে ওঠো–রাকেশ রায়ের জ্ঞান শোনো–শ্রুতির বাণী শোনো, দুটি ডিমের পোচ এবং চারখানি টোস্ট খাও। তারপর বাংলোর কম্পাউন্ডে সুপার অ্যানুয়েটেড সরকারি কর্মচারীর মতো সামনে ঈষৎ ঝুঁকে, পিঠে হাত দুখানি রেখে (রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা পরা চেহারার পোজে) পায়চারি করো। তারপর।

আর এক চুমুক খেয়ে নিল অর্জুন। তারপর স্যাঁতসেতে ছাগলনাদির মতো গন্ধভরা বাথরুমে ঠাণ্ডা কন্‌কনে জল ঢেলে চান করো–তারপর খাও। তারপর ঘুমোও। তারপর ওঠো। তারপর বসো। তারপর খাও। তারপর ঘুমোও। কিংবা শ্রুতিকে আদর করো এবং তারপর ঘুমোও।

আদর-টাদর আজকাল খেতে চায় না শ্রুতি। কেমন বুনো ঘোড়ার মতো জেদি হয়ে উঠছে। যদি ডাইনে যেতে বলে অর্জুন তো বাঁয়ে যায়। কী যে ব্যাপার, বুঝছে না। দিল্লিতে তো এরকম করত না। এখানে আসাই ওদের ভুল হয়েছে। সেখানে অর্জুনের ফ্ল্যাটের আরাম আর আয়োজনে, ওর চাকরির চাকচিক্যে ওর বন্ধু-বান্ধবী পার্টি-পিকনিকের ঘন ও নিবিড় নিরবচ্ছিন্নতায় শ্রুতির ভেতরের বুনো ঘোড়াটা লাগাম বাঁধা ছিল। কখনো ক্লান্তিতে তার মনের, ঠোঁটের কোণা বেয়ে ফেনা গড়িয়েছে কিনা জানতে যায় নি অর্জুন, কিন্তু এটুকু এখন বুঝতে পাচ্ছে যে এখানে এলে রাকেশ রায়, তার এই হরিব্‌ল জঙ্গলপ্রীতি–ধনেশ পাখি–বাঘমুণ্ডা (my foot) এই সব মিলে শ্রুতির উপর এল এস-ডি খাবার এফেক্ট হয়েছে।

শ্রুতি কেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে। কি ভাবে কি করে; ও যেন সবসময় কিসে ভোর হয়ে আছে; ভরে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্যাসু নাটসের একটি নতুন টিন কেটে এনে, সামনের বেতের চেয়ারে পা দুটি তুলে দিয়ে, নাট্‌স মুখে দিতে দিতে অর্জুন আর এক চুমুক দিল।

বড় বড় থামগুলোর ছায়া পড়েছিল চওড়া বারান্দায়। ঝির্‌ঝির্ করে হাল্‌কা হাওয়া বইছিল। একটি কমলা-রঙা প্রজাপতি ফিনফিনে পাখা নেড়ে উড়ে উড়ে ফুলে পাতায় বসছিল। হাওয়ায় তার পাখা কাঁপছিল।

সুব্বল রোজকার মতো বাঘের জন্যে বাঁধা মোষের তত্ত্বাবধান করতে গেছিল। রাজুয়াড়ু বাবুর্চিখানায় ছিল। রাকেশ কুয়োতলায় চান করতে গেছিল। শ্রুতি আর অর্জুন চুপ করে বসেছিল। দু'জনে দু'জনের ভিন্ন ভাবনাগুলি নিয়ে খেপলা জালের মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে অবকাশের বিলে ফেলছিল। ওরা নিথর হয়ে বাইরের রোদে ভরা বনের দিকে চেয়ে বসে ছিল।

অর্জুন ভাবছিল শ্রুতির কথা। কত বদলে গেছে আজকাল শ্রুতি। এক বিষয়ে সে ব্রিচ অব কন্ট্রাক্ট করেছে তার সঙ্গে। এমন কথা ছিল না। খাও–পিও–মৌজ করো–এই তিনটি কথা ছাড়া অন্য কিছুতে অর্জুন বিশ্বাস করে না–করেনি কোনো দিন। এসব গালে হাত দিয়ে বসে ভাবা–এসব তার কস্মিনকালেও আসে না–যাদের আসে, তাদের পেছনে পয়েন্টেড জুতো পরে লাথি মারতে ইচ্ছে করে।

শান্তনুকে মনে পড়ে অর্জুনের। শ্রুতির হেভি অ্যাডমায়ারার ছিল, কবিতা লিখত। গালে হাত দিয়ে ভাবত। প্রেমে পড়েছিল–একেবারে হেড ওভার হিলস। করলবাগে থাকত–চাকরির জন্যে–আসলে কোলকাতার যাদবপুরের

ছেলে–অর্জুনের স্কুলের বন্ধু। শান্তনু সবুজরঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরত। সরু শীর্ণ ঘাড়ে পাঞ্জাবিটা লটকে থাকত–কাকতাড়ুয়া যেমন লটকে থাকে বাঁশের ডগায়।

ও আবার পার্টি-ফার্টিও করত–কিসের পার্টি তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলত কংগ্রেসের দালাল, আবার কেউ কেউ বলত কম্যুনিস্টদের বশংবদ। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস পার্টি-ফার্টি সব বোগাস্। শালা পারমিট বাগানো কি ভাই-ভাইপোকে চাকরি দেওয়ার মতো ভেবেছিল, পার্টির ভাঁওতা মেরে শ্রুতিকেও বাগাবে।

ও যখন ওর সবুজ ঢোলা পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে সরু শিরা বের করা মুঠিবদ্ধ হাত বের করে, নাড়িয়ে–রাজনৈতিক খিচুড়ির হাঁড়িতে হাতা নাড়ার মতো–বক্তৃতা দিত–তখন অর্জুনের মজা লাগত; অর্জুনের মায়াও লাগত, কারণ প্রিহিস্টরিক ডাইনোসরস্‌কে পুজো করাও যা, আজকাল কোনো মতবাদকে পুজো করাও তা।

পুজো করার মতো আজকের দিনে কী আছে? নীতি-ফীতির কথা ছেড়েই দিল। নীতি তো কেবল মোটা বইয়েই লেখা থাকে। নীতি তো কোনো দিন বড় হয়নি–ও নিজে-নিজেই ঠাণ্ডা মেরে গেছে। ওর বোতলের ঝাঁঝ সব শেষ হয়ে গেছে। ও এখন জলপাইগুড়ির চা-বাগানের স্টোরস্‌কিপার। জলহস্তীর মতো কেলে-ভুচুং একটি খাণ্ডার মেয়েকে বিয়ে করেছে–ভদ্রমহিলা কম ময়ান দিয়ে ভাল লুচি বানাতে পারেন–তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যেই হয়েছে। শান্তনু রেগুলার স্টোরস থেকে মাল ঝেড়ে বাজারে বেচেছে। মহাসুখে আছে। গরুর মতো পান চিবোচ্ছে, দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাচ্ছে, রোগা রোগা দুব্‌লা হাতে আড়াই-মণি গোল স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ভস্ ভস্ করে ঘুমোচ্ছে। শালা বেঁচেও মরে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতিও ভাবছিল, অর্জুন আর আগের অর্জুন নেই। কত অন্য রকম ছিল ও আগে। কত ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল, কত বিবেচক ছিল, কত মজার ছিল। এখন খালি ড্রিঙ্কস্ আর ড্রিঙ্কস্, ফুর্তি আর ফুর্তি। স্থিতি বলে কোনো কথা আর অর্জুনের জীবনে নেই। শ্রুতি যেন অর্জুনের সঙ্গে কোনো সদাকম্পমান দ্রুতগতি ট্রেনের কুপেতে বসে আছে। ঝড়ের মতো চলে যাচ্ছে–কত সুন্দরী পাহাড়তলি, কত নদী, কত গাছ, কত ছায়া, কত মোষের পিঠে বাঁশী-বাজানো রাখাল ছেলে–সব ফেলে–সব ফেলে–এক অজ্ঞানতা থেকে অন্য অসীম অজ্ঞানতার দামি টিকিট কেটে ওরা দু'জনে উড়ে চলেছে। কোথাও থামা হচ্ছে না, দাঁড়ানো হচ্ছে না, ভাবা হচ্ছে না।

ওদের এই বঙ্কিম দ্রুতগতি, ঝাঁকুনিসর্বস্ব জীবনকে মাঝে মাঝে ট্যুইস্ট নাচের মতো মনে হয় শ্রুতির। মাইনে ছাড়াও আজকাল অর্জুন অনেক রকম উপরি রোজগার করে–তা শ্রুতি বুঝতে পারে। অথচ, অর্জুনের সতেরশো টাকা মাইনে এবং অন্যান্য পারকুইজিটে ওদের দু'জনের স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আরো টাকার কী দরকার জানে না শ্রুতি। এইরকম টাকার বিনিময়ে এ জীবনের কি দরকার!

বাচ্চা পছন্দ করে না অর্জুন। একেবারে পছন্দ করে না কিনা বুঝতে পারে না। তবে আপাতত করেই না। বলে, কি দরকার, ঝুট-ঝামেলায়? খাও-পিও-মওজ করো–ঝাড়া-হাত-পা। যেখানেই যাও, প্লেনে আজকাল ফিফটি পারসেন্ট ভাড়া বাচ্চাদের, জানো? ফিফটি-পারসেন্ট মানে আরো দুদিন কোনো ভালো হোটেলে থাকা। যতদিন

যৌবন থাকে, মস্তি থাকে, মেজাজ থাকে, মৌজ করে নাও। যৌবন ফুরিয়ে গেলে তারপর দু'জনে কোমরে কাপড় বেঁধে গান গাওয়া যাবে।

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
ছিঃ ছিঃ
হরদম লাগাতে ঝাড়ু
তব্ ভি অ্যায়সা হাল।"

অথচ শ্রুতির ভালো লাগে না। বিয়ের পর চার বছর হয়ে গেছে। এই লম্ফঝম্ফ আর ভালো লাগে না। ও একটি নরম নির্জন সুখে ভরপুর জীবন চায়। অর্জুনের জন্যে সে অনেক কিছু করতে চায়। অর্জুন সৎ হোক—অর্জুন বড় হোক—অর্জুন দশজনের একজন হোক। অর্জুন বড়লোক হোক এ কোনোদিন শ্রুতি কামনা করেনি। বড়লোকি তার বাবা-মার কাছে অনেক দেখেছে ও, শুধু টাকায় যে কিছু হয় না তাও জেনেছে। কিছু টাকা এবং...। এবং...। সেই এবং-ই নেই শ্রুতির জীবনে।

শ্রুতির ইচ্ছে করে, অর্জুন খুব খেটে-টেটে ক্লান্ত হয়ে রোজ ঠিক সময়ে অফিস থেকে ফিরবে—শ্রুতি ওর স্যুট-টাই সব নিজে হাতে তুলে রাখবে—তারপর ও যখন হাত-মুখ ধুতে বাথরুম যাবে, তখন শ্রুতি নিজে হাতে ওর জন্যে খাবার করবে চিঁড়ের পোলাও বা কিছু, নিজে হাতে চায়ের জল করবে। নিজে হাতে অর্জুনকে খাওয়াবে।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর অর্জুন শাল জড়িয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসে কিছু লিখবে কি পড়বে; নয়তো ওরা কোনো ভাল গান শুনবে কিংবা বাজনা—অথবা হয়তো কোনোদিন সপ্তাহে দুদিন কি একদিন কোথাও বেড়াতে যাবে—কোনো ভাল ছবি দেখবে—কোনো নিভৃত রেস্তরাঁয় যাবে, শ্রুতির সমস্ত সত্তা ঘিরে—কোনো সুগন্ধি আতরের মতো—প্রথম যৌবনের কোনো ভরন্ত ভালো লাগার মতো—অর্জুন—শ্রুতির সমস্ত শরীরে-হৃদয়ে ছড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু কিছুই হলো না। কিছুই হলো না। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে আদর করার মতো একটি সুন্টুনি-মুন্টুনি বাচ্চা পর্যন্ত হলো না। বন্ধ্যা হয়ে গেছে শ্রুতি—ও বন্ধ্যা হয়ে গেছে শরীরে এবং মনে—। ও আর ফল ফলাবার আশা রাখে না—মাঝে-মাঝেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

শ্রুতি তার কাছেই বসেছিল—অথচ অর্জুনের মনে হচ্ছিল ও যেন কত দূরে বসে আছে। কটকের গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম থেকে রাকেশদা ওকে একটি সম্বলপুরী শাড়ি কিনে দিয়েছে—দেখে মনে হয় সিল্ক। সেই শাড়িটি পরেছে শ্রুতি। মাথায় যত্ন করে তেল মেখেছে। একটি মিষ্টি-মিষ্ট গন্ধ বেরুচ্ছে মাথা থেকে। শ্রুতি মুখ ফিরিয়ে সেগুনবনের দিয়ে চেয়ে আছে—যেখানে বড় বড় পাতায় হাওয়া এসে ফিসফিস করছে। রোদ ঝিলমিল করছে।

অর্জুনের এসব এক ধরনের ন্যাকামি ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। পুরুষ মানুষ হয়ে নিজে হাতে গিয়ে পছন্দ করে মেয়েদের জন্যে শাড়ি কেনা, ভাবা যায় না। কেন, অর্জুন কি শ্রুতিকে শাড়ি কিনে দেয় না? অনেক দেয়। তবে নিজে হাতে নয়। টাকা ধরে দেয়। কড়কড়ে নতুন একশ টাকার নোটগুলো দিয়ে দেয় ও। বলে, যাও

খুশীমতো কেনো গিয়ে। তা নয়, নিজে ঘুরে ঘুরে ভালোবাসার লোকের জন্যে শাড়ি কেনা। পীরিত দেখানো। চলে না। রাকেশ বুড়োকে নিয়ে চলে না। অর্জুনের ভীষণ ঘৃণা হয় লোকটাকে।

ঐ আসছে। কুয়োতলায় সরষের তেল মেখে শর্টস পরে চান করে রাকেশ এল—পিঠের ওপর তোয়ালেটা ফেলা—সামনেটা বুকের দিকে টানা। সুন্দর দুটি সুগঠিত পা। যা হোক বুড়ো চেহারাটা রেখেছে ভাল। অর্জুনের থেকে কমপক্ষে পাঁচ-ছ' বছরের বড় হবে—সেই তুলনায় চেহারাটা রেখেছে ভাল। শালা ধনেশ পাখি। হেভি এন্থু শালার।

এন্থু কথাটা নিয়েই একদিন খুব ঝগড়া হয়ে গেল শ্রুতির সঙ্গে। অর্জুন কোলকাতার ছেলে—সেখানে পড়াশুনা করেছে—দুর্গাপুজোর সময় প্যান্ডেলের পেছনে বসে রাম খেয়েছে—

ট্যাক্সিতে নাইলন-পরা কড়া সেন্ট মাখা মেয়েদের নিয়ে অথবা পাড়ার সম্ভ্রান্ত গার্লফ্রেন্ডদের নিয়ে এখানে ওখানে ডে-স্পেন্ড করেছে। অর্জুন লাইফ দেখেছে। অনেক অনেক লোকের সঙ্গে, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছে। ও দেখেছে, ওর বন্ধুবান্ধব সকলেরই এরকম ভাষা রপ্ত হয়ে গেছে। লোকটির হেভি এন্থু—মানে লোকটি খুব উৎসাহী—এন্থু মানে এন্থুজিয়ামজম। মিস্টার সেনের হেভি ফান্ডা, মানে মিস্টার সেনের ফান্ডামেন্টারল জ্ঞান খুব দড়।

শ্রুতি এসব শুনলেই বলে, এরকমভাবে কথা বলার কি দরকার? না ইংরিজি, না বাংলা, না কিছু।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন মনে-মনে হাসল। তারপর মনে-মনেই বলল, ধ্যাৎ শালা—এবার কোলকাতা ফিরে গিয়ে কিরি কিরি কিরি কিরি ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ চালু করে দেব। রাকেশ ব্যাটা একটা বাঘডুম্বা।

আর এক চুমুক খেয়ে ও নিজের মনে বলে উঠল, বাঘডুম্বা।

শ্রুতি বলল, ও কি? কি হলো?

অর্জুন বলল, বাঘডুম্বা।

বাঘডুম্বা কি?

অর্জুন বলল, তুমি বিশ্বাস করো বাঘডুম্বা আছে?

বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। তবে মনে হয় এসব জায়গায় এসব থাকা অস্বাভাবিক নয়।

তুমি ভূতে বিশ্বাস করো? তোমার না ছোটবেলায় মেমসাহেব গভর্নেস ছিল?

শ্রুতি বলল, সেই তো প্রথম আমায় ভূতের কথা বলে, ভূত সত্যি।

মাই গুড্‌নেস! সর্ষের মধ্যেই ভূত!

শ্রুতি বলল, ভূত মানে জানি না, তবে আত্মা বলে কিছু আছে। আত্মা থাকলে–অভিশপ্ত আত্মা থাকাও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অসম্ভব নয়। মানে, এসব গভীর জঙ্গলে-পাহাড়ে এমন অনেক কিছু আছে–বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

তারপর শ্রুতি শুধোলো, কেন, তুমি ভূত মানো না?

অর্জুন বলল, আমি ভূত মানি না, ভবিষ্যৎও মানি না, আমি কেবল বর্তমান মানি। বলে সিগারেট-ধরা বাঁ হাতটি শ্রুতির দিকে তুলে বলল, কাছে এসো। আই ক্যান স্মেল এ প্রিমরোজ। কাম মাই ডার্লিং...।

শ্রুতি চোখ দিয়ে ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলল, কি হচ্ছে কি? পাশের ঘরে রাকেশদা জামাকাপড় পরছেন না?

অর্জুন হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলল, হুম–বাঘডুম্বা।

শ্রুতি বেশ উদ্বিগ্ন ও রাগত স্বরে, ততোধিক চাপা গলায় বলল, কি বলছ কি?

অর্জুন বলল, আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, আমি বাঘডুম্বায় বিশ্বাস করি।

শ্রুতি বলল, মানে?

মানে, এ এমন ব্যাপার, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। বলেই জোরে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কিরি কিরি কিরি কিরি–ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ।

BANGLADARSHAN.COM

এমন সময় রাকেশ বারান্দায় এল। একটি ফিকে হলদে হাফহাতা সোয়েটার পরেছে ফুল-হাতা ফিকে নীল পপলিনের শার্টের ওপর। পরনে সাদা শর্টস। পায়ে স্লিপার।

রোদে চেয়ারটা টেনে নিয়ে, রাকেশ বলল, কি ব্যাপার, অর্জুন? কিরি কিরি কিরি কিরি–ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ, কি বলছিলে?

শ্রুতি কথা কেড়ে বলল, আমরা বাঘডুম্বার কথা আলোচনা করছিলাম। জানেন রাকেশদা, আপনারা যেদিন চিতাবাঘটি মারলেন সেদিন আমি এই বারান্দায় বসে বাঘডুম্বার ডাক শুনেছি।

রাকেশকে খুব চিন্তান্তিত দেখাল, বলল, কখন?

কখন? মানে আপনারা ফিরে আসার অল্প একটু আগে। আমি হেঁটে গেট অবধি গেছিলাম–তারপর ফিরে আসছিলাম–যেই বারান্দায় উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম ঐ ডাক। আচ্ছা রাকেশদা, আপনি নিজে কখনও শুনেছেন?

রাকেশ দেখল, অর্জুন একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে–চোখের দিকে চেয়ে আছে। রাকেশ চোখের পাতা একটুও না নাড়িয়ে, শক্ত গলায় মিথ্যা কথাটা বলল, নাঃ।

অর্জুন বলল, কিন্তু আমার মনে হয় আছে।

রাকেশ বলল, কি আছে?

অর্জুন হাসল—ঘৃণার হাসি, তারপর ওর ঘৃণাটিকে ওর গিমলেটে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে—'এ ড্যাশ অফ বিটারস'-এর মতো নাড়িয়ে নিয়ে এক গালে পুরোটা গিলে ফেলল।

রাকেশ আবার শুধাল, কি আছে?

অর্জুন বলল, বাঘডুম্বা।

তারপর মনে মনে বলল, আমি বাঘ, আর তুমি বাঘডুম্বা।

BANGLADARSHAN.COM

॥আট॥

আজ ঠাণ্ডাটা বেশী। বেশ বেশী। কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে। হু-হু করে কনকনে হাওয়া ছেড়েছে। ঘরের ভাঙা শার্সির কোণ ডিঙ্গিয়ে শীস-দেওয়া আওয়াজ তুলে ফুরফুর করে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। শীতে রাকেশের ঘুম আসছে না। কম্বলটাকে ভালো করে কাঁধের নীচে, শরীরের দু'পাশে গুঁজে দিল। তাও শীত করছে।

বাংলোর মধ্যের ঘর, যে ঘরে ওরা বসে ও খাওয়া-দাওয়া করে, একটি ক্ষীণশিখা হ্যারিকেন জ্বলছে। রাকেশের ঘরের দরজার একটি পাল্লা ভেজানো বলে সামান্যই আলো আসছে এ ঘরে। যতটুকু আলো আসছে তাতে গান-র‍্যাকে বন্দুক, রাইফেলগুলো চকচকে করছে, ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখা টুপি ও ওয়াটার-বটলের বিরাট বিকৃত ছায়াগুলি দেওয়ালে ছড়িয়ে আছে।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। বাইরে কেবল একটানা ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন করে ঝিঁঝিরা নূপুর বাজিয়ে চলেছে। হঠাৎ ফরেস্টারের বাড়ির পেছনে কুলথী ক্ষেতে পাহাড় থেকে নেমে আসা একঝাঁক চিতল হরিণ টাঁউ টাঁউ করে ডেকে সেই অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতাকে আরো নিবিড় করছে।

শ্রুতিরা জেগে আছে। ও ঘর থেকে ফিসফাস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খাওয়ার টেবল ছেড়ে ওরা বড়জোর আধঘণ্টা হলো উঠেছে।

এইরকম ভীষণ শীতের রাতে রাকেশের রুমনির কথা মনে পড়ে যায়। রুমনি এলাকে নিয়ে আলাদা শুতো। এমনি শীতের রাতে রুমনি বলতো, আমার বড় শীত করছে গো, আমার কাছে একটু আসবে?

রাকেশ বলত, না।

এসো না, please! আমি ঠাণ্ডায় জমে গেছি–please এসো।

কেন, আমি কি তোমার কম্বল?

হ্যাঁ, এই কম্বলে আমার শীত মানছে না, তোমার বুকের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকলে আমার আর শীত করবে না।

রাকেশ জানে না, এখন রুমি কোথায় আছে। এই শীতে সে না-জানি কোথায় কোথায় বনেজঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কুয়াশায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেখাপড়া শিখে, বিজ্ঞানের নিত্যনূতন অগ্রগতির খবর জেনেও এইসব ব্যক্তিগত দুঃখ, ব্যক্তিগত প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি। চাঁদে এরা রকেট পাঠিয়েছে সত্যি, কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যি করে, সঠিক করে কেউ বলতে পারে না, তার রুমনি কেমন আছে, কোথায় আছে। সুখে আছে, না দুঃখে আছে–কেউ বলতে পারে না। সবাই অনেক বড় বড় সামাজিক, রাজনৈতিক, বিশ্ববিষয়ক ব্যাপারে ব্যস্ত আছে।

BANGLADARSHAN.COM

অথচ যতক্ষণ রুমনি ছিল ততক্ষণ তার অস্তিত্বের মতো এমন সর্বৈব সত্য আর কিছু ছিল না। কিন্তু তাকে পুড়িয়ে আসার পরমুহূর্তে জানতে হলো, সে যে ছিল এ কথার মতো সর্বৈব মিথ্যা আর কিছুই নেই। অথচ তার সব কিছু চতুর্দিকে ঘিরে ছিল, ঘিরে থাকবে। তার হাতের লাগানো বোগেন-ভিলিয়া, তার মমতামাখা মেয়ে এলা, তার পেতে রাখা ম্যাটস, তার আঁকা ছবি, তার শাড়ি, তার জামা, তার সব কিছু। তার দিয়ে যাওয়া, ফেলে যাওয়া অনেক সরল সুরেলা ক্ষণ। তারা সবাই আছে! এ সব সত্যি।

রাকেশ এই মুহূর্তে যেমন বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, মস্কিষ্কচালিত হয়ে ভাবছে এসব যেমন সত্যি; রুমনির মুখভরা হাসি, রুমনির পাগলামি যে কেবল স্মৃতি রোমন্থনেরই জন্যে মাত্র, এও সত্যি। সে আর কোনোদিন এমন শীতের রাতে কখনো কখনো আদুরে গলায় তার স্বামীকে ডাকবে না, বলবে না,–আমার বড় শীত করছে, আমার কাছে একটু এসো না গো!

যতদিন ও বেঁচে ছিল ততদিন এইসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাকে, টুকিটাকি কথাকে অত্যন্ত সাধারণ, এবং এমন কি কখনো কখনো বিরক্তিকর বলেও মনে হতো। মনে হতো ঢং, বেশী বেশী। কিন্তু আজ আর তা মনে হয় না রাকেশের। আজ তার অল্প যেটুকু ছিল তা হারিয়ে যাওয়ায় রাকেশ বুঝতে পেরেছে, এই নিত্যনৈমিত্তিক

টুকিটাকি নিয়েই জীবন। কারো জীবনেই রোজ রোজ কোনো বৃহৎ ও মহৎ ঘটনা ঘটে না। এই অবহেলায় ভুলে থাকা রোজকার অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্যেই সকলের কামনা। এর মধ্যেই সমস্ত সাধ, নিংড়ানো সুখ।

সত্যি কথা বলতে কি, রুমনি যতদিন বেঁচে ছিল, রাকেশের মনে হতো, রুমনি তাকে সম্পূর্ণভাবে সুখী করতে পারে নি। মনে হতো, অনুক্ষণ মনে হতো, রুমনিকে বিয়ে করে সে ভুল করেছে, রুমনিও বলত যে রুমনিরও তাই মনে হতো। এমন কি ওরা কোনো-কোনোদিন কোনো মর্মান্তিক মনোমালিন্যের পরে দু'জনে দু-পক্ষের উকিলের মতো আশু ডিভোর্স সম্বন্ধে আলোচনাও করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেখা যেত সেই রাতেই দু-পক্ষেরই ডিভোর্সের স্থির ও অনড় সিদ্ধান্ত নেবার পর রুমনি রাকেশের বিছানায় ঘন হয়ে শুয়ে ফিসফিস করে বলতো, ঈস্, কত সাহস! ডিভোর্স করবেন! বল তো, আমাকে ছাড়া একদিনও চলবে তোমার? আমি বলে তোমার সঙ্গে রয়েছি—নইলে অন্য কোনো মেয়ে থাকত না। আমি মরে গেলে তোমার এক দিনও চলবে না। ডিভোর্স করবেন, কত বড় সাহস! তারপর রুমনি রাকেশের কানের কাছে মুখ এনে বলত, এই লোকেরা কী করে ডিভোর্স করে বল তো। তারা নিষ্ঠুর হয় না? রাকেশ তাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে বলত, কি করে করে-দেখাচ্ছি, কালই আমি সলিসিটারের কাছে যাব। তারপরই রুমনিকে জড়িয়ে ধরে রিচার্ড বার্টনের মতো চুমু খেত রাকেশ। রুমনি হাত-পা ছুঁড়ত, অস্ফুটে বলত, ওরে আমার মিঠুয়ারে, উনি করবেন ডিভোর্স, করলে বাঁচতাম।

রুমনি প্রায়ই বলত, সে মরে গেলে রাকেশের একদিনও চলবে না। মানে তার এত অসুবিধা ও কষ্ট হবে যে সে বাঁচবেই না। কিন্তু সেকথা সত্যি হয়নি। রুমনির মৃত্যুর পর আজ অবধি অনেকবার তাদের বিয়ের তারিখ ফিরে এসেছে—তবু রাকেশ ঠিকই আছে। বছরের পর বছর কেটে গেছে। বিয়ের তারিখে অফিস ছুটি নেওয়ার জন্যে রুমনি আর ঝগড়া করেনি, রুমনির জন্যে রাকেশ আর কিছু কিনে আনেনি, আর ওরা সেই দিনটিতে বাইরে কোথাও খায়নি। সত্যি কথা বলতে কি, রুমনির মৃত্যুর পর ওদের বিয়ের তারিখকে সকলে যেন ভয়াবহ একটা ঘটনার স্মারক হিসেবে ভুলে গেছে, রাকেশ সুদ্ধু।

BANGLADARSHAN.COM

একমাত্র শ্রুতি। শ্রুতি একমাত্র মনে করে রেখেছে বরাবর, বরাবর। প্রতিবার নিজের কাজের ক্ষতি করেও রাকেশের কাছে এসেছে। সমস্ত দিন রাকেশের কাছে থেকেছে। রাকেশকে ভুলিয়ে রেখেছে। গত বছর ওদের বিয়ের তারিখে শ্রুতি এসেছিল সন্ধ্যাবেলা। রাকেশ কি ভেবে একটি মুক্তোর দুল কিনে নিয়ে এসেছিল। উপরের খোলা বারান্দায় বসে ওরা চা খাচ্ছিল। রাকেশ দুল দুটি শ্রুতিকে পরাতে যেতেই শ্রুতি অবাক হয়ে বলেছিল, ও কি, রাকেশদা?

রাকেশ বলেছিল, রুমনির অভাব যদি আংশিক ভাবেও ভরিয়ে থাকে আমার জীবনে তা হয়তো তুমি। একমাত্র তুমিই। যেমন এটা সেই ঋণের স্বীকৃতি। সব ঋণ তো এ জীবনে শোধ করা যায় না, যেমন মা-বাবার ঋণ; কেবলমাত্র স্বীকার করা যায়। সেইটুকু আমাকে করতে দাও।

শ্রুতির মুখ কালো হয়ে গেছিল। মুখ নিচু করে বসেছিল, বলেছিল, আমার কাছে আপনার কিসের ঋণ? রাকেশ হেসে বলেছিল, তুমি অনেক কিছু দিয়েছ শ্রুতি—অনেক কিছু। মনে মনে বলেছিল, আমার মনের শৈত্য, আমার

স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল নৈরাশ্যকে তুমি এস স্বর্গীয় আশায় ভরে রেখেছ অনুক্ষণ–তুমি জানো না তুমি আমাকে কি দিয়েছ। ব্যথা, অনেক অস্বস্তি যেমন দিয়েছ, তেমন আনন্দনিকেতনও হয়েছে। যেদিন এই শরীর ছাড়িয়েও বাঁচতে শিখব, সেদিন হয়তো তোমার যথার্থ সম্মান করতে পারব। তবু নিজেকে এই যে সবসময় একটি বিড়ালে খাওয়া কবুতরের মতো ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত রিক্ত করছি–যা চেয়েছি তা ভুলে গিয়ে যা পেয়েছি তাই নিয়েই সব সময় নষ্টষ্ট হতে বলছি–এও কি কিছু নয়? শ্রুতি কেবল বলত, রাকেশদা, আমার এসব ভাল লাগে না। নইলে আমার কি আছে যা আপনাকে দিইনি। যা দিইনি তা আমার কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। আমি হয়তো একটু অন্য রকম, কিন্তু আমার ভাল লাগে না রাকেশদা, আমার ওসব ভাবতেও ভাল লাগে না।

শুয়ে শুয়ে রাকেশ ভাবছিল, সত্যিই শ্রুতি অন্য রকম। অন্য রকম না হলে হয়তো রাকেশের তাকে এমন করে ভালও লাগত না এবং ভাগ্যিস সে একটি অসাধারণ মেয়েকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছিল, নইলে রুমনির মৃত্যুর পর তার এই একা একা চরা-চরা চল্লিশে সে অনেকানেক সাধারণ কাজ করে ফেলত–মানে, হয়তো না করে উপায় থাকত না–সেই সব মেয়ের হাসিতে ভুলত, যারা বাড়ি ফিরে তাদের হাসি ধুয়ে ফেলে। ছোকরা কনট্রাকটর, উঠবি কবি ও বুড়ো বিড়ি পাতার ব্যবসাদারের প্রেমিকাও তার প্রাণের প্রেমিকা হয়ে যেত। প্রতিবার তাদের কাছে যেত, আর রুমনির প্রেতাত্মা তাদের পরচুলার ফাঁকে ফাঁকে কোনো বিষাক্ত বাতাস হয়ে ঘুরে বেড়াত। ফিসফিস করত।

BANGLADARSHAN.COM

নাঃ, শীতটা বেড়েই চলেছে। শুয়ে থাকা যাচ্ছে না আর। রাকেশ উঠে পড়ল, জানালার ভাঙা শার্সির কাছে ওয়াটার-বটল্‌টাকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর বাথরুমে গেল। বাথরুমের বাইরের দিকের দরজাটা খোলাই ছিল। চৌকিদার জল দেবার পর কেউ আর ভিতর থেকে বন্ধ করেনি। রাকেশ দরজাটা টেনে বন্ধ করতে গিয়ে একবার বাইরে তাকাল।

বাইরে জমাট-বাঁধা কালো অন্ধকার–বোবা অন্ধকার। রাকেশ বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তারারা সারি সারি আলোকঝারির মতো সবুজ সান্ত্বনার আলো ছড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা কোটরা ডেকে উঠল কুরাপের দিক থেকে–বাঘ কি চিতা দেখে থাকবে। এমন সময় ঐ ঘরের বাথরুমে কি একটা আওয়াজ হলো। কেউ বাথরুমে গেছে।

অর্জুন আর শ্রুতি এতক্ষণ কি ফিসফিস করছে জানতে ইচ্ছে করে রাকেশের। রুমনি বুকভরা সুখের স্বাদ নিয়ে কিন্তু সুখী না হয়েই বিনা নোটিশে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। রাকেশ সুখের সন্ধানে অনুক্ষণ ফিরছে, কিন্তু সুখ কাকে বলে জানেনি। ওর ইচ্ছে করে, কোনো যুবতীর কবুতরী কবোষ্ণ বুকের মত মুঠিভরে কোনোদিন সুখকে ধরবে–নাড়বে-চাড়বে, জলতরঙ্গের মত বাজাবে। কিন্তু যতবারই সুখকে ধরতে গেছে, সুখের জলে থাবড়া মেরেছে, আঁচলা বেয়ে জলের মত সবটুকু সুখ গড়িয়েই গেছে–রয়েছে শুধু যা ভরামুঠি দীর্ঘশ্বাস।

রাকেশের বড় জানতে ইচ্ছে করে শ্রুতি সুখী হয়েছে কিনা। শ্রুতির পক্ষে সুখী হওয়াই স্বাভাবিক। ওর এত বুদ্ধি নিয়ে, ওর এত বিবেচনা নিয়ে ও যাকে বিয়ে করেছে তাকে নিয়ে ও নিশ্চয়ই সুখী হয়েছে। সবদিক দিয়ে সুখী হয়েছে।

হঠাৎ রাকেশের অসীম সাধ হলো ও গিয়ে উঁকি মেরে সুখকে দেখে আসে। সে সুখ কী তা ও জানে না, শ্রুতি আর অর্জুন যে সুখের সৃষ্টি করেছে–যে সুখে ভরপুর আছে ওরা, সেই সুখের সূত্র একবার আবিষ্কার করে আসে।

এ কথা মনে হতেই রাকেশ পা টিপে-টিপে ওদিকে ঘরের দিকে এগোতে থাকল বাংলোর পেছন দিয়ে।

ওদের ঘরের হ্যারিকেন বেশ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। একটি শার্সি ভাঙা ছিল, কিন্তু তাতে শ্রুতি একটি বই দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। সেই ভাঙা শার্সির কাঁচটি তেলচিটে হয়েছিল।

রাকেশ ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল। তারাভরা আকাশ এবং গহন বন তার দিকে এক অসীম নিঃশব্দ কৌতূহলে চেয়ে রইল। একটি টীটী পাখী অন্ধকারে উড়ে উড়ে বলতে লাগল–ডিড ইউ ডু ইট? ডিড ইউ ডু ইট? ডিড ইউ ডু ইট?

রাকেশ জানালায় সেই তেলচিটে স্বচ্ছ জায়গায় ডান চোখ ছোঁয়াল।

ঘরে শ্রুতি নেই। অর্জুন ডান হাতে সিগারেট ধরে দুটি হাত খাটের বাইরে টানটান করে ঝুলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। বুক অবধি কম্বলটা টানা। অর্জুন একমনে সিগারেট টানছে–শুয়ে শুয়ে ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ছে।

শ্রুতি বাথরুমের দরজা ঠেলে এল। একটি হালকা সবুজ কটস্উলের নাইটি পরেছে। বুকে ও কাঁধে ফ্রিল দেওয়া। পায়ের পাতা অবধি ঝুল। ঐ লণ্ঠনের কাঁপা-কাঁপা আলোয় চাঁপাফুলের মত রঙে স্বচ্ছ কটস্উলের নাইটির রঙ মিশে গিয়ে কেমন এক স্বর্গীয় আভা ফুটে বেরোচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি রাকেশের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে ক্রিম বের করে মুখে মাখতে লাগল দু-হাত দিয়ে ঘষে ঘষে। ওর সুন্দর মরালী গ্রীবায় সোনালী আলো ছড়িয়ে রইল। সেই মুহূর্তে শ্রুতির গ্রীবায় আলতো করে একটি চুমু খেতে ওর খুব ইচ্ছে করল।

এমন সময় শ্রুতি বলে উঠল, আমি ঘেন্না করি।

রাকেশ চমকে উঠল। তারপরই বুঝল যে, শীতের রাতে তার উপস্থিতি কেউ টের পায়নি।

শ্রুতি বলল, তোমাকে আমি ঘেন্না করি।

অর্জুন ঐভাবেই শুয়ে শুয়ে বলল, কেন?

অনেক কারণে।

কি কারণে?

বলে লাভ?

অর্জুন বলল, সেকথা সত্যি। কারণ তা জেনেও আমার লাভ নেই। তা ছাড়া তুমি আমাকে কতটুকু ঘেন্না কর, আমি আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশী ঘেন্না করি।

মানে?

মানুষ নিজেকে যত তীব্রভাবে ঘৃণা করতে পারে, অন্য কি কেউ তা পারে?

তা আমি জানি না। কিন্তু তুমি আমাকে কোনো বিষয়েই সুখী করতে পারোনি।

সব বিষয়ে যে সুখী করতে হবেই এমন কোনো ওয়ারান্টি বন্ডে সই করে তো আমি তোমায় বিয়ে করিনি। কথা ছিল দু'জনে চেষ্টা করব দু'জনকে সুখী করার।

শ্রুতি বলল, সে চেষ্টা কি তুমি করেছ?

অর্জুন সিগারেটটা খাটের পাশের অ্যাস-ট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, সার্টেনলি। তোমার কি তাতে কোনো সন্দেহ আছে?

সন্দেহ আছে কি নেই সেটা অবান্তর—তবে চেষ্টা করলেও পারতে কিনা অজানা আছে আমার। কীসে লোকে সুখী হয়, সে সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

কীসে সুখী হয়?

তোমাকে বলার আমার কি দরকার? প্রয়োজন মনে করলে নিজেই এতদিন জেনে নিতে।

অর্জুন এবার চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে কেটে বলল, তোমাদের মন-ফন এমোশনাল সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার বুঝি না, তবে এটুকু বলতে পারি এর চেয়ে বেশী সুখী তোমাকে কেউ করতে পারত না। শারীরিক ব্যাপারে তো বটেই।

শ্রুতি বলল, শারীরিক ব্যাপারের তুমি কি বোঝ?

তার মানে? এবার অর্জুনের গলা বেশ উত্তেজিত শোনাল।

তার মানে, কি করে যে কোনো সদ্বংশজাতা মেয়েকে আদর করতে হয় তা তুমি জানোই না।

আমি জানি না তো কে জানে, তোমার রাকেশদা?

শ্রুতি ক্রিম মাখা থামিয়ে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

পাশ থেকে নাইটি-পরা শ্রুতিকে সেই স্বল্পালোকিত ঘরে কী এক পবিত্র দেবীপ্রতিমার মতো মনে হতে লাগল। ও বলল, অর্জুন, মুখ সামলে কথা বল—তুমি লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

হঠাৎ অর্জুন এক লাফে কম্বল ছেড়ে, বিছানা ছেড়ে নামল। বলল, না, তোমাকে বলতে হবে কে জানে। তোমার রাকেশদা? তুমি নিশ্চয় আগে তার আদর খেয়েছ?

শ্রুতি আক্রান্ত একটা সজারুর মতো ঝমঝম করে বেজে উঠল, বলল, হ্যাঁ, খেয়েছি। তাতে কী হয়েছে? তুমি কি আমায় বিয়ে করার আগে কাউকে আদর করোনি? তোমাদের ডিফেন্স কলোনির একজন পাঞ্জাবী মেয়েকেও?

রাকেশের ইচ্ছা হলো, ও শার্সিতে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—মিথ্যে কথা অর্জুন, মিথ্যে কথা। শ্রুতিকে আমি কোনোদিন আদর করিনি—কোনোদিন। শ্রুতি যে তার ভাবী স্বামীর জন্যে তার শরীর একটি শরৎ সকালের শিউলির মতো নিষ্পাপ, শ্বেত পবিত্রতায় বাঁচিয়ে রেখেছিল—ও তো কোনোদিন কোনো অন্যায় করেনি। কাউকে ওর স্নিগ্ধ শরীরের সুবাস দেয়নি।

অর্জুন শ্রুতির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল—মুখে হিন্দি সিনেমার ভিলেইন-এর ভাব ফুটিয়ে—রাকেশ পরিষ্কার দেখতে পেল, শ্রুতি যা বলছে তার পেছনে সত্য আছে, আর সেই সত্যকে ঢাকবার জন্যে অর্জুন মুখে চোখে নাটকীয় ভয়াবহতা এনে শ্রুতিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে—রাকেশ বুঝতে পারল যে, অর্জুন খালি ভয় দেখাচ্ছে—এবং এও বুঝতে পারল যে, শ্রুতি সত্যিই হেরে গেছে ওর নিজের দম্ভের কাছে। অর্জুন শ্রুতির কাছে এসে দু হাতে ওর দু কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি শ্রুতি, ভবিষ্যতে এরকম কথা তোমার মুখ থেকে যেন আর না শুনি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি রাজহাঁসের মতো গ্রীবা উঁচিয়ে বলল, তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, এসব কথা যেন আর না শুনি।

অর্জুন কিছু না বলে শ্রুতিকে কেবল একটি ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজের খাটে উঠে পড়ল। শ্রুতিও হ্যারিকেনের শিখাটি সামান্য কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর বিছানায় এসে উঠল। তারপর এ পাশে, জানালার পাশে—মুখ ফিরিয়ে শুল।

রাকেশের চোখ থেকে মাত্র এক হাত দূরে শ্রুতির সুন্দর নরম মুখটি কাঁধ অবধি ঢাকা গোলাপী কম্বলের উপর দেখা যেতে লাগল। রাকেশ দেখল, শ্রুতির দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে—সমস্ত গাল জলে ভিজে যাচ্ছে। রাকেশের খুব ইচ্ছা করল যে, সে বইয়ের আড়ালটি সরিয়ে ভাঙা শার্সির মধ্যে দিয়ে তার হাতটি বাড়িয়ে শ্রুতির চোখের জল মুছিয়ে দেয়, ওর অশান্তি শুষে নেয়। যে তাকে কোনোদিন আদর করতে দেয়নি—সেই গরবিনীর গলিত গরবে নিজের চোখ ভেজায়।

নিঃশব্দে রাকেশ সরে এল। ওর মুখটি তেতো-তেতো লাগতে লাগল। চোখ ভিজে উঠল। একটু আগে ও নিজের সুখ, নিজের অসুখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল—কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু শ্রুতির কথা ভেবে তার দু'চোখের কোণ জলে ভরে এল।

বাথরুমের পেছনের দরজা দিয়ে ওর ঘরে ঢুকতেই শুনল, কুটুর, কুটুর করে শব্দ হচ্ছে ঘরে। ঘরে পা দিয়েই রাকেশ দেখল, চৌকিদারের দুঃসাহসী কুকুরটা চিতাবাঘের ভয় অগ্রাহ্য করে এসে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টেবলের উপরে রাখে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট খাচ্ছে কুটুর কুটুর করে।

রাকেশের হঠাৎ রাগ চড়ে গেল মাথায়। রাকেশ মনে মনে বলল, তুইও কি সুখের সন্ধানে ঘরে উঁকি মারতে এসেছিলি? বলেই স্লিপার-পরা অবস্থায়ই এক লাথি মারল কুকুরটার পেছনে—কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠল—বিস্কিটগুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

ও-ঘর থেকে শ্রুতি চেঁচিয়ে শুধোল, রাকেশদা, কি হলো?

রাকেশ বলল, ঘরে কুকুর ঢুকেছে।

শ্রুতি আবার বালিশে মাথা রেখে মনে মনে বলল—আমার ঘরেও।

BANGLADARSHAN.COM

॥নয়॥

গাড়িতে যাবার পথ নেই। গাড়ি ছেড়ে প্রায় এক মাইল পায়ে-চলা-পথে হাঁটতে হয়। তবু ভাল, বাঘে মোষ মেরেছে। নইলে এযাত্রা বাঘের সঙ্গে মোলাকাতই হতো না। জিপগাড়ি থেকে আলো ফেলে ফেলে রাতে অনেকে শিকার করেন—রাকেশও আগে আগে করেছে—কিন্তু তাকে শিকার বলে না। তাতে কোনো রকম মজাই নেই। আইন অমান্য তো করা হয়ই, তা ছাড়া সেরকম শিকার কোনো স্পোর্টসই নয়। আজকাল ভাবলেও খারাপ লাগে রাকেশের।

শ্রুতি বলেছিল সঙ্গে আসবে, কিন্তু ওকে নিবৃত্ত করেছে কোনক্রমে। তা ছাড়া বাঘে-মারা মোষকে দেখার মতো কিছুই নেই। জিবটা বেরিয়ে থাকবে। ঘাড়ের কাছে দুটি ফুটো, পেছন থেকে খেয়ে যাবে আগে। চাপ চাপ রক্ত জমে যেতে থাকবে চারপাশে। কতগুলি মাছি ভনভন করবে। আর মৃত্যুর পরিপূরক এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা চারিদিকে ঘিরে থাকবে।

পথে একটি ঝর্না পড়ল। তা এমনি পেরোনো গেল না। জুতো মোজা খুলতে হলো। শর্টস পরেছিল বলে ট্রাউজার খোলার ঝামেলা রইল না।

তখন সকাল এগারোটা হবে। সমস্ত বন পাহাড়ে শীতের শান্ত রোদ ঝিলমিল করছিল। মাথার অনেক উপরে একটি পাহাড়ী বাজ ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছিল। পথের ডানদিকের বাঁশঝাড়ে একটি বনমোরগ কঁ-র-কঁ-র-কঁ-কঁ-কঁ করে দূরের হারেমকে কাছে আসতে বলেছিল।

একটি টিলায় উঠতে হলো, টিলা পেরিয়ে সেগুন আর শালবনে প্রায় দু ফার্লং গিয়ে আর একটি পাথরময় টিলা পাওয়া গেল। তার নীচে রাস্তাটি ডাইনে বাঁক নিয়েছে।

রাকেশ বলল, এত দূরে বেঁধেছিলে কেন মোষ?

কি করব, এটাই যে যাতায়াতের রাস্তা ছিল বাঘের।

কাছাকাছি গাছ আছে? দেখেছো?

হ্যাঁ, বাবু। একটা কুচিলা গাছ আছে, আর একটা অশোক গাছ। যেখানে মাচা বাঁধতে বলবেন সেখানেই বাঁধব।

সামনের সেই টিলার নীচে পৌঁছে ডাইনে মোড় ঘুরতেই দেখা গেল সতেজ হলদে-সবুজ ঘন ঘাসের মধ্যে মোষটিকে টেনে নিয়ে গেছে বাঘটি। ঘাসের মধ্যে পরিষ্কার ড্যাগমার্ক আছে। নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগও পাওয়া গেল।

BANGLADARSHAN.COM

থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটি কাঁধে ঝোলানো ছিল এতক্ষণ। কাঁধ থেকে নামিয়ে তিনটি গুলি লোড করল রাকেশ—তারপর রেডি পজিশনে ড্যাগমার্ক দেখে আগে আগে যেতে লাগল। সুব্বল ও বাঘমুণ্ডা গ্রামের চারজন লোক দা এবং দড়ি নিয়ে পেছন পেছন আসতে লাগল।

প্রায় হাত পঁচিশেক গিয়েই মড়ি পাওয়া গেল।

বেশ অনেকখানি খেয়ে গেছে বাঘটা—শক্ত হয়ে যাওয়া চার পা টান-টান করে শুয়ে আছে মোষটা, একটা বেঁটে ঝাঁকড়া শিশুগাছের ছায়ায়। শকুনের চোখের বাইরে। এক দিকের পেটের পাঁজর বেরিয়ে রয়েছে। তখনো টুপ টুপ করে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। রাকেশ চোখ থেকে সান গ্লাসটি খুলে চারিদিকে ভাল করে ঘুরে ঘুরে জমি নিরীক্ষণ করতে লাগল। দেখল, বাঘটি ভোরে উত্তরের ঘাসবন পেরিয়ে, বাঁশের জঙ্গল পেরিয়ে, নালা টপকিয়ে টিলাটির পাশ দিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ডুঙরি পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

খুব ভাল করে দেখল রাকেশ, গাছগুলি এবং মড়িটি কোথাও নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখা যায় কিনা, তাও ভেবে দেখল। সুব্বলের সঙ্গে ফিসফিস করে পরামর্শ করল।

মুশকিল হচ্ছে যে, দুটি মাচা বানাতে হবে। অথচ এসব জিনিস রাকেশ মোটেই পছন্দ করে না। রাকেশের এই স্বল্প অভিজ্ঞতাতেও এমন বহুবার হয়েছে যে, অন্য লোকে মাচাতে থাকতে বা অন্য লোকের অধৈর্য বা মূর্খামির জন্যে বাঘ মারা হয়নি। কারণ মাচায় বসা এক সবিশেষ দুঃসাধ্য কাজ। অথচ শ্রুতি নাছোড়বান্দা। সে রাকেশের

সঙ্গে বসবেই, বাঘ শিকার দেখবেই এবং অর্জুনও বলেছে যে শ্রুতি গেলে সেও যাবে। সে কি এখানে ভেরেণ্ডা ভাজতে এসেছে? অথচ এক মাচায় তিনজন বসা যাবে না, সেজন্য দুটি মাচা করতে হবে এবং দুটি মাচা করলে অর্জুনকে এক মাচায় বসানো যাবে না। কারণ বাঘের উপস্থিতিতে কার কখন কি অবস্থা হয় তা ভগবানও বলতে পারেন না। অতএব অর্জুনের সঙ্গে সুব্বলকে বন্দুক দিয়ে বসাতে হবে। এ যে যাত্রা পার্টি হয়ে গেল। ভাবল রাকেশ। কিন্তু উপায় নেই। শ্রুতি এমন কথাও বলেছে যে, মাচায় নাই যদি বসতে দেবেন তো নিয়ে এলেন কেন এত কষ্ট করে এত দূরের জঙ্গলে।

অশোক গাছটি যে জায়গায় আছে সেখান থেকে ঘাসবন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাঘ খুব সম্ভব আসবে কুচিলা গাছের নীচের পথ বেয়ে।

রাকেশ ঠিক করল, মোষটিকে অন্য কোথাও সরাবে না। যদিও অন্ধকার রাত, তবু বাঘ এলে ঘাসে তার আসার শব্দ পাবেই—ঘাসগুলি বেশ বড় বড় হয়েছে—বাঘ যেদিক দিয়েই আসুক মড়িতে ঘাস পেরিয়ে নিঃশব্দে সে আসতে পারবে না। ও আর শ্রুতি কুচিলা গাছে বসবে, অর্জুন আর সুব্বল বসবে অশোক গাছটায়।

কতখানি উঁচুতে মাচা হবে তা দেখিয়ে দিয়ে রাকেশ সুব্বলকে বলল, দূর থেকে কাঠ ও পাতা কেটে আনতে, যাতে এখানে শব্দ না হয়। বাঘ হয়তো যেখান থেকে এসেছিল সেই পাহাড়েই গেছে, কিন্তু কিছু বলা যায় না, কাছাকাছি কোথাও শুয়ে থাকতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

ওরা চলে গেল। রাকেশ অশোক গাছটির নীচে একটি শুকনো ভাঙা ডালের উপরে বসে পাইপটা ভরতে লাগল। কতগুলো ছাতারে পাখি পেছন থেকে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—ছ্যাছ্যা ছ্যাছ্যা করে শুকনো পাতার ঝোপেঝাড়ে নড়েচড়ে বসতে লাগল।

এরকম একেবারে একা থাকলেই ওর মনে সেই সব ভাবনাগুলি ভিড় করে আসে। তার অভিমান, তার কান্না, তার জ্বালা—সব ভিড় করে আসে। তারা একদল অবাধ্য ল্যাটা মাছের পোনার মতো, পুকুরঘাটে ডুবিয়ে রাখা এঁটো বাসনের মতো রাকেশকে ঠুকরে মারে। ও তখন হাসতে হাসতে হেরে যেতে থাকে।

একা থাকলেই রাকেশের মনে পড়ে যায় যে, বরাবর রাকেশের ভালোবাসাকে—তার অশেষ নিরুপায় ভালবাসাকে—কোনো এক বিশেষ ধান্দা বলেই জেনে এসেছে শ্রুতি। এ কথা মনে হলেই মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে রাকেশের। যে আগুনে রাকেশ জ্বলত, সে আগুনের জ্বালাকে সস্তা নামেই ডেকেছে শ্রুতি। রাকেশ শ্রুতিকে বোঝাতে পারেনি যে, আগুন মাত্রই ভয়াবহ নয়। ভালবাসার চমৎকার চকমকিতেও আগুন জ্বলে, আবার শুধু দেহসর্বস্ব মাংস-রসিকের দীন দেশলাই দিয়েও আগুন জ্বালানো যায়।

অবশ্য আজ শ্রুতির দাহ্য শরীরও আগুনে আহুতি হয়েছে। দগ্ধ হয়ে গেছে। অর্জুনের জ্বালা সে নির্বাপিত করছে। ভাবলেও অবাক লাগে যে, একদিন যে শ্রুতি চুমু খেতে চাইলেই চমকে চমকে উঠত—'আমার ওসব ভাল লাগে

না, ভাল লাগে না' বলত, সেই শ্রুতিই শিগগিরি একদিন "ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে।"

জীবনের সব ধনই ফেলা যায়। সমস্ত সযত্নরক্ষিত পরম ধনই বোধ হয় এক দিন ধূলায় অবহেলিত হয়।

রাকেশ পাইপটাকে নতুন করে ভরতে লাগল কিংবা নিজের মনের পোড়াগন্ধ শূন্যতাকে। ও জানে না।

সুব্বল তার দলবল নিয়ে হলুদ গাছের ডাল কেটে ঝুপরি ঝুপরি কচি কুচিলা ও অশোকের ঝাড় কেটে ফিরে এল। তারপর কুচিলা গাছটিতে আগে মাচা বাঁধতে আরম্ভ করল। মাথার উপর পাতার ছাউনি দিতে হবে, নইলে হিমে বসা যাবে না। মাচাটিও শক্ত হওয়া চাই। সারারাত বসতে হবে হয়তো, শ্রুতি এতক্ষণ সোজা হয়ে নাও বসে থাকতে পারে।

ওরা গাছের উপরে দড়ি আর হলদু'র ডাল নিয়ে উঠে গেল। প্রথমে মাচা বেঁধে তারপর মাথার ছাউনি ও পাশের আড়াল তৈরী করল কুচিলার পাতা দিয়ে—কুচিলা গাছে আড়াল কুচিলা পাতারই হওয়া চাই। নইলে বাঘ সন্দেহ করবে। সামনেটাও ঢেকে দিল, কেবল সামনে এবং ডান পাশে বেশ বড় বড় দুটি ফাঁক রাখল, যা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে রাকেশ গুলি করতে পারে।

মাচা বাঁধা হয়ে গেলে ওরা নেমে এসে অশোকগাছে গিয়ে উঠল মাচা বাঁধতে—তখন রাকেশ কাটা গাছের ডালের তৈরী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। মাচাটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

না, বেশ বড় ও প্রশস্ত হয়েছে। ইচ্ছে করলে শুয়ে থাকাও যায়। রাইফেলটি ঘুরিয়ে দেখে নিল, ভাল করে ঘোরানো যাচ্ছে কিনা। না, এমনিতে সব ঠিক আছে। এখন শ্রুতি যদি মাচায় বেশী আওয়াজ-টাওয়াজ না করে এবং বাঘ যদি ফেরে—তা হলেই হল।

মাচায় বসে নালাটির একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। টিলাটি দেখা যাচ্ছে। নালা বেয়ে জল যাবার ঝিরঝিরানি শব্দও কানে আসছে। এইটেই রাতে অসুবিধার কারণ হবে, কেননা রাতের নিস্তব্ধতায় এই শব্দই বহুগুণ জোরে শোনা যাবে এবং সেই শব্দে নিঃশব্দপদসঞ্চারী বাঘের আওয়াজ ঘাসের মধ্যে শোনা না গেলেই মুস্কিল।

সুব্বলের মাচা বাঁধা হয়ে গেলে ওরা নেমে এল। রাকেশও নেমে এল। তারপর ওরা একত্র হয়ে সিংগল ফরমেশানে জঙ্গলের আলোছায়ায় ডোরাকাটা প্রভাতী পথে বাঘমুণ্ডার দিকে ফিরে যেতে লাগল।

এখন মনে হচ্ছে এযাত্রা বাঘটি মোষ না মারলেই ছিল ভাল। কেন জানে না, ভারী ক্লান্তি লাগছে রাকেশের। সব মিলিয়ে এ-ই বনে আসার দোষ। বেশী দিন এখানে এসে একসঙ্গে থাকলেই সভ্যতার সংস্কারের আবরণে মরচে পড়ে যায়। তখন নিজেকে ভয় করতে থাকে। তার চেয়ে দিল্লির রোজকার একঘেয়ে জীবনও ভাল মনে হয়। এই ডাইনী বনের জাদু ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে মনে মনে—সমস্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি যুক্তি কেমন ভোঁতা হয়ে যায়—কেমন এক সর্বৈব মানসিক স্থূলতা এসে সত্তা অধিকার করে বসে। রাকেশ এই প্রকৃতি যেমন ভালবাসে, তেমন

একে ভয়ও পায়। এই ভয়টা সব সময় হয় না, মাঝে মাঝে, কখনো কখনো—হঠাৎ একসময় এই ভয়টা সমস্ত মন ব্যাপ্ত করে ফেলে। সংস্কার যত হালকা হতে থাকে, এই ভয়টা পাতায়, ফুলে, প্রজাপতির ডানায় ততই ফরফর করে কাঁপতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে সুব্বল শুধোল, বাবু, কোন্ রাইফেল নিয়ে বসবে রাতে? থার্টি-ও-সিক্স?

আর কি করব বল? বড় রাইফেলটির তো দু-ব্যারেলের মধ্যে ডান ব্যারেলে ফায়ার হচ্ছে না! ও রকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। বাইসন মারতে গিয়ে কি অবস্থা হলো দেখলে না?

সুব্বল মাথা নাড়িয়ে বলল, সে কথাটা ঠিক।

তারপর রাকেশ প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, থার্টি-ও-সিক্স আমার হাতের রাইফেল। তাছাড়া ক্ল্যাম্প ফিট করা আছে। বাঘ যদি চেহারা দেখায় একবার তাহলে মারতে অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য গুলি যদি ঠিক জায়গায় লাগাতে পারি।

সুব্বল সায় দিয়ে বলল, আজ্ঞে সেটাই আসল কথা। গুলি ঠিক জায়গায় লাগলে বাঘ মরবে না, এ একটা কথা?

হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ বাঘটির কথা ভাবছিল। মদ্দা বাঘ—পায়ের দাগ দেখে মনে হয় বেশ বড় সাইজের। সাড়ে নয় থেকে দশ ফিটের মধ্যে হবে। দেখা যাক কি হয়।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলোর কাছাকাছি এসে গেল ওরা। এদিকে বারোটা প্রায় বাজে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি আর অর্জুন বারান্দায় রোদে বসে আছে। ঘন হয়ে বসে আছে। ওরা কি যেন বলাবলি করছে। শ্রুতি মাঝে মাঝে হেসে ঢলে পড়ছে।

অবাক লাগল রাকেশের—তবে কি কাল রাতে সে সত্যিই সুখকে আবিষ্কার করেছিল? তাহলে সুখের কি কোনো নিজস্ব চেহারা নেই? সুখ কি জলের মতো? যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের রূপ নেয়?

অর্জুন আর শ্রুতিকে এই মুহূর্তে দেখে কে বলবে যে, কাল ওরা দু'জনে দু'জনের প্রতি এক দুর্মর ঘৃণায় বেঁকে গিয়ে শীতের রাতে কেঁচোর মতো শুয়েছিল? এখন ওরা হাসছে, গল্প করছে, খুনসুটি করছে—সর্ষেক্ষেতের দুটি হলদে-হাসিনী প্রজাপতির মতো ভালবাসায় কাঁপছে।

এই ভাল, ভাবল রাকেশ, এই ভাল। ওরা সুখী হোক, সুখী থাকুক, ওরা দু'জনে চিরদিন সুখে থাকুক। রাকেশের বোঝা রাকেশ একরকম করে বইতে পারবেই—যেমন করে বয়ে এসেছে। শ্রুতি সুখী হোক। অর্জুন সুখী হোক।

আহা, অর্জুন ছেলেমানুষ! পুরুষের শরীরও শরীর, মেয়েরা তা কখনো বোঝে না। ভাল সেতারী হলেই কি কেউ রোজই ভাল বাজাতে পারে? কোনো কোনো দিন সেতারের দোষেও তো বাজনা খারাপ হতে পারে? সেতাররা

কোনোদিন তা স্বীকার করে না। বাজনা ভাল না হলেই–আঙ্গুল দেখায় সেতারীকে। বলে, তুমি, তুমি, তুমি; তুমি জানোই না কি করে আলাপ করতে হয়, কি করে আদর করতে হয়।

শ্রুতিটা একটা পাগলী। রুমনি যেমন ছিল।

এই রোদ ভরা পাখির ডাক ভরা আশা ভরা সুগন্ধি সকালটিকে বড় ভাল লাগতে লাগল রাকেশের। তাহলে এখনো সুখ আছে পৃথিবীতে–এখনো সুখী লোক আছে–ধরতে পারুক আর নাই পারুক, এই জানাটাই মস্ত জানা যে ইচ্ছে করলে সুখকে মুঠিভরে ধরা যায়।

ভীষণ ভাল লাগতে লাগল রাকেশের। সেই পবিত্র স্বাধিকারে সবুজ জঙ্গল কোনো রঙীন ফুলে-ছাওয়া গাছের নীচে নতজানু হয়ে বসে, উদ্দীপ্ত আদিগন্ত সূর্যদেবের কাছে আয়ুভিক্ষা করতে ইচ্ছে করল রাকেশের। জোড়করে বলতে ইচ্ছে করল, আমাকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখ–অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখ, হে সূর্য, হে সুপুরুষতম সুপুরুষ, হে আনন্দের আনন্দ। আমাকে আরো অনেক দিন, অনেক দিন তোমার আলোয় ভরা পৃথিবীতে, তোমার পাখিডাকা বনে বনে একটি মুগ্ধ ভক্ত অনাবিল মন নিয়ে সুন্দরের খোঁজে খোঁজে ফেরাও। আমাকে রোজ সকালে, আজ সকালের শ্রুতি আর অর্জুনের সুখী ছবির মতো কোনো সুন্দর সুখের দৃশ্যের সম্মুখীন করো। আমাকে বাঁচিয়ে রাখ–বহুদিন, নিশিদিন, অনুক্ষণ–অনুক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী যতদিন বাঁচবে, গাছে গাছে যতদিন ফুল ফুটবে, নির্জন ঘাসে যতদিন কাঁচপোকা গুনগুনিয়ে ফিরবে, আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখ হে সূর্য–আমাকে ততদিন প্রাণদান কর। বিহ্বল হয়ে বলল রাকেশ।

ওরা বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল।

শ্রুতি বলল, রাকেশদা, আপনার নলাপোড়ার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন বাঁধলেই হয়।

রাকেশ রাইফেলটা রেখে এসে ভাল করে দেখল বাঁশটিকে। একটি মোটা কচি বাঁশের টুকরো টেবলে রাখা হয়েছে। দুটি গাঁটই অক্ষত আছে। বাঁশটির সবুজ গা থেকে একটি মিষ্টি মিষ্টি সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। রাকেশ দু হাতে বাঁশটি তুলে নিয়ে বলল, মাংস কোথায়?

শ্রুতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন বাবুর্চিখানায় আছে, রাজুয়াড়ুকে বলেছি ধুয়ে রাখতে।

বাঁশটি বগলে নিয়ে রাকেশ বাবুর্চিখানার দিকে চলল শ্রুতির সঙ্গে। কাল বিকেলে সুব্বল একটি কোটরা মেরেছিল। রাকেশ বলেছিল ওদের যে বাঁশপোড়া করে খাওয়াবে।

রাজুয়াড়ু মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছিল। একটি সসপ্যানে হলুদ এবং পেঁয়াজ ও আদা বাটা মাখিয়ে ভাল করে মাংসগুলি মাখল রাকেশ। তারপর বাঁশের টুকরোটির এক পাশের বন্ধ মুখ ছুরি দিয়ে ফুটো করল। দেড় ইঞ্চি মতো ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে মেখে রাখা মাংসের টুকরোগুলি সব গলিয়ে দিতে লাগল।

শ্রুতি উৎসুক চোখে দেখছিল, বলল, এ মা, নুন দিতে ভুলে গেলেন?

রাকেশ বলল, নুন দিতে হয় না। নুন দিলে হয়তো বাঁশের ভিতরে যে জলীয় পদার্থ থাকে তার সঙ্গে মিশে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, যার ফলে মাংস খেতে বিস্বাদ হয়ে যায়। কক্ষনো নুন দিতে নেই।

তারপর বাঁশের টুকরোটি মাংসে ভর্তি হয়ে গেলে, কাদা দিয়ে খোলা মুখটি ভাল করে বন্ধ করে দিল রাকেশ এবং বাঁশটির গায়ে ভাল করে কাদার প্রলেপ দিল। তারপর সুব্বলকে বলল, আগুন জ্বালো সুব্বল। সুব্বল কাঠের আগুন করল বাবুর্চিখানার বাইরের সিঁড়ির সামনে এবং আগুন বেশ গনগনে হয়ে উঠলে সেই বাঁশটি আগুনের মধ্যে গুঁজে দিল সুব্বল।

শ্রুতি বলল, ব্যস, হয়ে গেল?

প্রায়। এখন যেই দড়াম আওয়াজ করে বাঁশটি আগুনে ফেটে যাবে, তক্ষুনি আগুন থেকে বের করে আনতে হবে। বাঁশটি ফাটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি বের করে ফেলতে হবে, তারপর প্লেটে প্লেটে দিয়ে সঙ্গে নুন দিয়ে সার্ভ করবে। একেবারে ডিল্লিসস্।

শ্রুতি এতক্ষণ উজ্জ্বল চোখে রাকেশের দিকে চেয়েছিল। প্রশংসাসূচক গলায় বলল, বাঃ, বাঃ, আপনি দেখি মোতিমহলে চাকরি পেতে পারেন বাবুর্চি হিসেবে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, অ্যাপ্লাই করলে হয়তো পেতেও পারি।

শ্রুতিকে সেই সকালে ভীষণ ভীষণ ভী-ষণ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। একটি ছাইরঙা ভয়েল পরেছিল। কোথা থেকে ছাইরঙা একগুচ্ছ জংলী ফুলও যোগাড় করেছিল খোঁপায় পরার।

এরকম কোনো মেয়ে পাশে থাকলে, মনের কাছে থাকলে যে কোনো সাধারণ পুরুষ অসাধারণ কাজ করে ফেলতে পারে। পরীক্ষায় বৃত্তি পেতে পারে অথবা পাইলট হয়ে শত্রুপক্ষের বিমানঘাঁটিতে চমকপ্রদভাবে বম্ব করে আসতে পারে এবং আরো অনেক কিছু করতে পারে। সব মিলিয়ে সকালটি রাকেশের ভীষণ ভাল লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ শ্রুতিকে শুধোল, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?

হুঁ। আপনার?

আমার খুব শীত করছিল।

তাই বুঝি কুকুরকে পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন?

রাকেশ হাসল, বলল, যা বলেছো। সেই রকমই অবস্থা। কুকুরটা বাথরুমের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

সে কি? ঘরের দরজাও খোলা ছিল নাকি?

ছিল। আমার মনের মতো আমার ঘরের দরজাও সব সময় খোলাই থাকে।

দরজা খোলা থাকা ভাল, কিন্তু তা দিয়ে কুকুর না ঢোকাই ভাল।

রাকেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, আসলে একটু বেরিয়েছিলাম বাইরে।

শিকারে?

না, এমনি।

সে কী! এই না বললেন খুব শীত করছিল, তাহলে বাইরে বেরোলেন কেন?

এমনিই—ভাবলাম, ঘরেই এত শীত তো বাইরে কত শীত দেখি।

কী দেখলেন?

দেখলাম, শীত ঘরেও নেই বাইরেও নেই, শীত আমার মনে।

শ্রুতি বলল, এখনো আছে?

না, এখন নেই। এখন তো রোদ উঠে গেছে। আমার সুখের রোদ। তুমি।

BANGLADARSHAN.COM

আর রুমনিদি?

সেও আমার সুখ। সুখ ছিল। এখন তার স্মৃতি আছে।

শ্রুতি হাসল, বলল, আপনার তো সুখের শেষ নেই।

রাকেশও ওর দিয়ে চেয়ে সকালের সোনা-রোদে হাসল, বলল, কথাটা বোধ হয় ঠিকভাবে বলতে পারলে না। বলো আমি সুখের ভিখারী।

শ্রুতি একটু দাঁড়াল, বলল, ইস্ ভিখারি, আমার ভিখারি!

॥দশ॥

দুটি ছাতার কানের কাছে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করছিল।

বাঘটা একবার চোখ খুলে ওদের ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে গেলো। ও একবার আড়মোড়া ভাঙল। তাতেই কাজ হলো। পড়ি কি মরি করে পাখিগুলো ধুলো উড়িয়ে পিটীস জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। বাঘটার ঘুম ভেঙে গেছিল।

বাঘটা একবার পাতার ঝুপরি দিয়ে বাইরে তাকাল। এখন দুপুর। কাল রাতে খাওয়াটা বেশী হয়ে গেছে। মোষটা খুবই নধর এবং কচি ছিল। আগে দুধের বাঁট দুটো খেয়েছে, তারপর পেছনের একটা থাই এবং অন্যান্য নরম জায়গা। আজ রাতে খেতে খেতে যদি ভোর হয়ে যায় তো যাক, আজ মোষটাকে শেষ করে ফেলবে খেয়ে। তারপর ঝর্নার পাশে গিয়ে পেটভরে জল খেয়ে আবার এই ছায়ায় এসে টান-টান হয়ে শুয়ে থাকবে। পরশুর আগে আর গুহায় ফিরবে না।

মোষটা ওখানেই বাঁধা থাকত এ ক'দিন। অন্য একটা মোষকেও দেখেছে কুরাপের রাস্তায়। কি ব্যাপার কে জানে? পথ ভুলে গেছিল নাকি? হবে হয়তো। অত দিয়ে বাঘটার কী দরকার? ক্ষিদের সময় খাবার হাতের কাছে কোথায় আর পাওয়া যায়? তাছাড়া এমন আয়েস করে খাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

দিনকয়েক আগে একটা শিঙ্গল শম্বর ধরতে তাকে দু মাইল পাহাড়ে জঙ্গলে অনুসরণ করতে হয়েছিল। নোনা মাটিতে যখন নুন চাটতে নামল শম্বরটা, তখন ধরবে বলে গুঁড়ি মেরে জায়গামতো পৌঁছল বাঘটা, ঠিক তক্ষ্নি একটা কোট্‌রা কী করে বাঘটার গন্ধ পেল—হাওয়ায়। কোট্‌রাটা নিশ্চয়ই বাঘটার পেছনের জঙ্গলে কোথাও ছিল। কোট্‌রাটা ডেকে উঠল দুবার—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঘাক ঘাক আওয়াজ করে অত বড় শিঙ্গল শম্বর লতাপাতা ঠেলে একদৌড়ে পাথরে খুর খটখটিয়ে একেবারে পাহাড়ের মাথায়। তখন তাকে ধরে কে? শিকার ধরা চাট্টিখানি কথা? বাঘটাই জানে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

রোদটা লতাপাতার ফাঁক দিয়ে এসে গায়ে পড়েছে। ভারী আরাম লাগছে বাঘটার। আকাশের দিকে বাঘটা একবার চোখ তুলে চাইল। বাঘিনীর চোখের মতো নীলাভ আকাশ। বাঘটা একটা ঢেকুর তুলল, তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

মাথায় ঘষে ঘষে সরষের তেল মাখছিল সুব্বল। দু'তিনটি পাকা চুল পট-পটিয়ে টেনে তুলল—চুল পেকে গেছে সুব্বলের। বয়স তো কম হলো না—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে—যখন ছোট ছিল তখন কুড়ি বছর বয়সের লোকেদেরই কেমন বুড়ো বুড়ো মনে হতো—ভাবলে হাসি পায়—আর এখন ওর নিজেরই পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তবুও তো বেশ ছোক্‌রা আছে ওর বউয়ের তুলনায়। বউটা কেমন দিদিমার মতো বুড়িয়ে গেছে। আগে কেমন জল-পাওয়া লাউডগার মতো সতেজ ছিল, কালো রঙের কেমন এক পিছলে-পড়া জেল্লা ছিল—এখন কেমন শুকনো ধুন্দুলের

মতো হয়ে গেছে। ঐ বড়জোর মাঝে মাঝে গা-ঘষা যায়। ভাল লাগে না সুব্বলের। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু ফুরিয়ে যাবে সুব্বল ভাবতে পারেনি।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে গেরুয়া গামছা পরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে সুব্বল বাঘটার কথা ভাবতে লাগল। মনে হয় আজ বাঘটা ফিরবে মড়িতে এবং ফিরলে চোট হবে। রাকেশবাবুর হাতে রাইফেল থাকতে বাঘ পালাবে এ হবে না।

রাকেশবাবুর মতো যদি দু'একদিনের জন্যে কেউ আসে, ওর রোজকার একঘেয়ে জীবনের তাও যা একটু আনন্দ হয়। সুন্দর সুন্দর মেমসাহেব দেখা যায়, ভাল মন্দ খাওয়া যায়, চকচকে বিলিতি বন্দুক রাইফেল কাঁধে করে সারাদিন সারারাত ঘুরে বেড়িয়ে ওগুলোকে নিজের বলেই মনে করা যায়। ওগুলোর ওপর কেমন মায়া পড়ে যায়। ফিরে যাবার সময় আবার বাক্সবন্দি করে যার জিনিস তাকে ফেরত দিতে হয়, তখনি বুকটা মুচড়ে ওঠে। সুব্বল এর পরের জন্মে বড়লোক হয়ে জন্মাবে, লেখাপড়া শিখবে, ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলবে, রাকেশের মত ভাল বন্দুক রাইফেল কিনবে এবং তারপর জীবনের আর অসুখী হবার কি থাকতে পারে?

শ্রুতি বারান্দায় বেতের চেয়ারে পা টান-টান করে বসেছিল। বেগুনীর উপর জংলা কাজের একটা বাটিক পরেছে শ্রুতি–বেগুনী জামা। হাতাটা ছোট–হাতার প্রান্তে মোটা করে প্লেট দিয়ে মুড়ে সেলাই করা। এরকম হাতায় শ্রুতির মতো যাদের সুন্দর ছিপছিপে হাত, তাদের দারুণ স্মার্ট দেখায়। রাকেশ হেলান দিয়ে বসে বসে একটা পুরোনো ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে শ্রুতিকে দেখছিল। অর্জুন একটি চেয়ারে বসে অন্য চেয়ারে পা রেখে গ্লাস থেকে বিয়ার সিপ করছিল। পাশের টুলে বিয়ারের বোতল দুটি ছিল। ওই প্রথমে কথা বলল। বলল, কে কোন্ মাচায় বসবে?

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ বলল, তুমি আর শ্রুতি একসঙ্গে বসবে, অন্যটাতে আমি আর সুব্বল।

শ্রুতি বলল, না রাকেশদা, তা হবে না। আমি শিকার দেখব–আমি আপনার সঙ্গে বসব।

রাকেশ বলল, শিকার তুমি হয়তো অন্য মাচাতে বসেও দেখতে পাবে।

না। দেখতে পাই আর নাই পাই, আমি আপনার সঙ্গে বসব। অর্জুনের সঙ্গেও কারো বসা দরকার। সুব্বল বসতে পারে। মানে সঙ্গে একজন শিকারী থাকা দরকার।

অর্জুন বলল, আমি সুব্বলের সঙ্গেই বসব–তোমার সঙ্গে আমি এমনিতে বসতাম না।

কেন?

কেন কি? তুমি থাকলে তো তোমাকেই সামলাতে হবে, বাঘ দেখব কখন?

ইস্, কি আমার শিকারী রে নিজেকে কে সামলায় তার ঠিক নেই।

অর্জুন কেমন এক রহস্যময় হাসি হাসল। বলল, শিকারী শিকারী–বড় শিকারী! কি জান তুমি? শিকার না করলে কি শিকারী হওয়া যায় না? তাছাড়া রাইফেলের মেকানিজ্‌মের উপরে আমার কতগুলো প্রবন্ধ আমেরিকা ও জাপানের কাগজে বেরিয়েছে, তুমি জানো না বুঝি?

আহা, ও সবই তো জানি। কিন্তু ও তো বন্দুকের কারিগরি। আমি সত্যিকারের শিকারীর কথা বলছি।

অর্জুন বলল, অল রাইট্, আমি তো তোমার সঙ্গে বসছি না, আর কি চাও?

শ্রুতি রাকেশকে বলল, দেখেছেন রাকেশদা? কেমন একটুতে রেগে যায়? তারপর অর্জুনের দিকে ফিরে ফিরে বলল, রসিকতা বোঝো না একটুও–সেন্স অফ হিউমার নেই তোমার এক ফোঁটা।

অর্জুন চকিতে একবার মুখ ঘুরিয়ে শ্রুতির দিকে তাকাল, তারপর একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, সেন্স অফ হিউমার না থাকলে বাঘডুম্বায় বিশ্বাস করি! তারপর ওরা তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

রাকেশ বলল, খাওয়ার কি অনেক দেরি?

শ্রুতি বলল, রান্না সব হয়ে গেছে–কেবল ভাতটা নামায়নি, তারপর টেবিল সাজাতে যতটুকু সময় লাগে। কেন, আমাদের কি দেরি হয়ে যাবে?

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন বলল, দেরি হোক্ না হোক্, খাওয়ার পর আজকে সকলেরই একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

আমাদের দরকার নেই। রাকেশদা নেবেন। রাকেশদার অনেক পরিশ্রম হয়েছে সকালে রোদে। শ্রুতি বলল।

রাকেশ ম্যাগাজিনটা টেবিলে রাখল। বলল, আমার বিশ্রামের কোনো দরকার নেই।

আবার ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

দ্বিতীয় বিয়ারের বোতলটা খুলল অর্জুন–চাবির রিং-এর সঙ্গে বটল-ওপ্‌নার ছিল। তারপর গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, সেদিন আমি একটি নেকড়ে দেখেছিলাম।

কোন্ দিন?

যেদিন বিকেলে আমরা হাঁটতে গেছিলাম।

শ্রুতি বলল, তুমি নেকড়ে চেন? নেকড়ে না ছাই! শিয়াল দেখে থাকবে।

না, আমি নেকড়েই দেখেছি।

শ্রুতি বলল, অনেক সময় নিজের ছায়াকে ঐরকম মনে হয়।

বিশেষ করে আমার ছায়াকে তো নিশ্চয়ই, কি বল?

শুধু তোমার কেন, পুরুষমানুষ মাত্রই নেকড়ে বাঘ।

অর্জুন বলল, হয়তো সব পুরুষ নয়।

শ্রুতি বলল, বলছ বড় বাঘও আছে? মানে, বড় মনের বাঘ।

আছে! অর্জুন বলল।

আবার বাঘ-ডাঁশাও আছে, যাকে ভাম অথবা খাটাশ বলে। গাছে উঠে পাখির নরম তুলতুলে ছানা খায়–রান্নাঘরে ঢুকে ক্ষীরের হাঁড়িতে মুখ ঢোকায়।

শ্রুতি বলল, তাও আছে–কিন্তু তা দেখে ভয় পাবার কি আছে?

না। অর্জুন বলল, বাঘ-ডাঁশাকে তো ভয় পায়নি, পেয়েছিলাম নেকড়েকে, ভাবলাম সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র নেই–যদি তাড়া করে?

শ্রুতি বলল, আচ্ছা নিজেকে তুমি কখনো নিজে তাড়া করেছ?

সব সময়ই তো করছি।

BANGLADARSHAN.COM

কই, শব্দ শুনতে পাই না তো!

শব্দ পাবে না। স্বপ্নে তাড়া করি। রোজ।

রাকেশ বলল, তোমরা থামবে? কি যে সব সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছ–দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার।

হবে। আপনার কেন, অন্য সকলেরই হতো। আমাদের না হয় এরকমভাবে কথা বলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে–কি বল অর্জুন?

অর্জুন বলল, প্রায়।

রাকেশের এত কথা এবং তদুপরি এত ঘোরালো কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। ও এখন কনসেনট্রেট করবার চেষ্টা করছিল। বাঘটার বুক, ঘাড় এবং মাথা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশের কথা একেবারে ভুলে যেতে চাইছিল। রাকেশের গুলি যেন বাঘটার বুক কিংবা ঘাড় ছাড়া অন্য কোথাও না লাগে। মাচা থেকে এ্যাংগুলার শট্ হবে–এ্যাংগুলার শট রাকেশের পছন্দ নয়–কিন্তু উপায় নেই। রাকেশ মাথায় মারতে চায় না। মাচা থেকে মাথায় মারা কঠিন, তাছাড়া মাথায় লাইট রাইফেল দিয়ে ও গুলি করার ঝুঁকি নিতে চায় না।

রাকেশ জীবনে একবারই পেটে-গুলি-খাওয়া বাঘের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই স্মৃতি খুব মধুর নয়। ডনাল্ড বেকার এবং রুসি আরদেশার সেই শ্যুটে ছিল। আগের দিন মাচা থেকে ডনাল্ড বাঘকে গুলি করে–তিস্তার চরে। বাঘ গুলি খেয়ে চলে যায়। পরদিন আটটি হাতী দিয়ে চরে ওরা বিটিং করেছিল। চমৎকার সকাল–মে মাসের নীল

আকাশ। দূর থেকে তিস্তার গর্জন ভেসে আসছে, ফুরফুর করে এ্যালিফ্যান্ট গ্রাসের মাথা দুলিয়ে হাওয়া বইছে–ওরা বিট শুরু করল। রুসির হাতে হল্যান্ড এন্ড হল্যান্ডের থ্রি-সেভেনটিফাইভ ম্যাগনাম ডাবল-ব্যারেল। ওর হাতীতে হাওদা ছিল না, সামনে মাহুত বসেছিল, পিছনে ও একা। গদীর উপরে দু'দিকে দু পা দিয়ে বসে, এক হাতে গদীর দড়ি ধরে আর অন্য হাতে রাইফেল কোলের ওপর ধরে বসেছিল। ওরা একসঙ্গে এগোচ্ছিল।

প্রথম পনেরো মিনিট বাঘের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না–এমন কি রাকেশের মনে হয়েছিল–হয়তো ডনাল্ডের গুলি কাল রাতে লাগেনি। কিন্তু ডনাল্ড বলছে যে লেগেছে এবং ডনাল্ড যেহেতু বলছে সেই হেতু গুলি লাগেনি বলার আগে দুবার ভাবতে হয়েছিল।

এমন সময় বাঁদিকের একটা হাতী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অন্য হাতীগুলোর হাবেভাবে বোঝা গেল বাঘ সামনে আছে। হাতীদের বৃত্ত ধীরে ধীরে ছোট করে এগোতে লাগল মাহুতরা। সকলে টেন্‌স হয়ে রইল।

হঠাৎ বাঁদিক থেকে রাণা গুহ গুলি করল–গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গ্রান্ড প্রিক্স রেসে রেসিংকার যেমন করে মোড় নেয়–তেমনি করে কোমর বেঁকিয়ে মোড় নিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে বাসের মধ্যে দিয়ে বাঘটা এদিকে আসতে লাগল। রুসি আরদেশার রাইফেল তুলল, গুলি করল, কিন্তু গুলি বাঘের সামনে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা এসে হাতীর পেট কামড়ে ধরল। রুসি অনেক কিছু করতে পারতো–করতও হয়তো, কিন্তু সেদিন সেই সুন্দর সকালে রাকেশদের সকলের চোখের সামনে একটি মর্মন্তুদ দৃশ্য অপেক্ষা করে ছিল–যা ওরা কেউ দেখতে হবে বলে ভাবেনি।

BANGLADARSHAN.COM

রুসি হঠাৎ কিছুই না করে ঐ অবস্থায়ই ভয়ে কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে হাতী থেকে লাফিয়ে পড়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘাস ঠেলে দৌড়তে লাগল। ওরা অবাক হয়ে দেখল যে, রাইফেলটাও হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। বাঘটা তখনো হাতীর পেট কামড়ে ছিল–হাতীটা সামনের দু'পা উপরে তুলে সোজা হয়ে আধো-দাঁড়ানো ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বাঘটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল–তখনো বাঘটা ওকে দেখে থাকলেও রুসির দিকে নজর দেয়নি।

এমন সময় রুসি ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হেল্প মি ইউ সোয়াইনস'–এবং সে চীৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা হাতীকে ছেড়ে একলাফে চোখের পলকে ঘাসের মধ্যে ঢুকে অসহায় রুসিকে ধরে ফেলল–ধরে ওর সমস্ত মাথাটা প্রায় মুখে পুরে ফেলল–তারপর আর একলাফে আবার ঘাসের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাকেশরা সকলে স্থাণুর মতো হাতীর পিঠে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সবক'টি হাতী দৌড় করিয়ে আবার বাঘকে ওরা খুঁজে বের করল এবং বাঘটি সেদিন পনেরোটি গুলি খেয়েছিল।

প্রতিহিংসার অনর্থক গুলি। অথচ সময়মতো এবং সুযোগমতো একটি গুলি করা গেলে রুসি আরদেশারকে বরাবরের মতো তিস্তার ঐ সুন্দর চরে ওরা হারিয়ে আসত না।

কখন যে কি হয় কেউ জানে না এবং জানে না বলেই যতটুকু আনন্দ এই রাইফেল হাতে ঘুরে বেড়ানোয়। তবু রাকেশ কোনো বাঘের পেটে গুলি করতে চায় না–কেউ ভুল করেও করুক–তাও চায় না।

রাজুয়াড়ু ও-ঘরে এসে গেছে—টেবল সাজানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে টুংটাং করে—ক্ষিদেটাও বেশ চন্‌চনে হয়েছে—এমন সময় সাইকেলে চেপে খাকি পোশাক পরে ফরেস্টারবাবু এসে হাজির।

রাকেশ বলে উঠল, কী খবর ফরেস্টারবাবু?

এই পূর্ণাকোট গেছিলাম রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে—আপনার দুটি চিঠি এসেছে, নিয়ে এলাম। বলে বুকপকেট থেকে চিঠি দুটি বের করে রাকেশকে দিল। রাকেশ দেখল মুসৌরীর ছাপমারা একটি, অন্যটি শ্রুতির নামে।

শ্রুতি শুধোল, কার চিঠি?

একটি তোমার, অন্যটি আমার—এলা লিখেছে।

অর্জুন বলল, বাঃ, অতটুকু মেয়ের খুব দায়িত্বজ্ঞান তো!

দায়িত্বজ্ঞানের চেয়ে বড় কথা, চিঠি লেখার অভ্যেস। শ্রুতি বলল—আমার তো চিঠি লিখতে হবে ভাবলেই জ্বর আসে।

রাকেশ বলল, বসুন, ফরেস্টারবাবু। কিছু খাবেন? আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়ে যান না?

BANGLADARSHAN.COM

ফর্সা গোলগাল লাজুক-লাজুক ফরেস্টারবাবু বললেন, না না, বাড়িতে রান্না হয়ে গেছে।

শ্রুতি বলল, তাহলে এক গ্লাস সরবৎ খান। বলে শ্রুতি ভিতরে চলে গেল।

ফরেস্টারবাবু বললেন, বাঘে তো মোষ মারল। দেখা যাক, কি হয়! তবে মড়িতে ফিরে আসার chance খুব কম। এ বাঘটাকে আমি যতদিন এই posting-এ আছি ততদিন থেকে চিনি। বাঘটি খুব বেয়াড়া। এর জন্যে মাঝে তো আমার সাইকেলে করে পূর্ণাকোট টিকরাপাড়া যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। যখন কোনো কনট্রাকটরের ট্রাক আসত, তখন ট্রাকে যেতাম—আবার ফেরার সময় অন্য ট্রাক ধরে ফিরে আসতাম।

অর্জুন বলল, কেন, কি করত?

তেমন কিছু করত না—দুপুরবেলাও মাঝে মাঝে বড় রাস্তার মধ্যিখানে বসে থাকত।

রিয়্যালি? ভেরি ফানি! অর্জুন বলল।

শ্রুতি এক গ্লাস লেমন-স্কোয়াশ ও একটি মালপোয়া এনে ফরেস্টারবাবুকে দিল। ফরেস্টারবাবু লাজুক-লাজুক মুখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, এখন আর বসব না, আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়। চলি।

ফরেস্টারবাবু সাইকেল চেপে শোলার টুপি মাথায় চাপিয়ে কাঁকরে কির্‌কির্‌ শব্দ তুলে চলে গেলেন।

শ্রুতি ওর চিঠিটা ফস্ করে ছিঁড়ে খুলল, বলল, বাবাঃ, আমার কি ভাগ্যি! মা আমাকে চিঠি লিখেছেন।

শ্রুতি চিঠি পড়তে লাগল চেয়ারে বসে পড়ে।

রাকেশ এলার চিঠিটা খুলল। এলার চিঠি এলেই কীরকম ভাল লাগে রাকেশের। এলা যখন পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল—টুকটুকে ফর্সা ছিপছিপে মেয়েটা—বুদ্ধিমাখা কথা বলত, তখন থেকেই বুড়ী-বুড়ী, খুব বড় বড় ভাব। রুমনি মারা যাবার পর ও যেন রাতারাতি আরো অনেক বড় হয়ে গেছে। রাতারাতি রাকেশের গার্জেন হয়ে গেছে। এলাকে দেখে রাকেশ বুঝতে পারে, মেয়েদের কাছে বয়সটা একটা কোনো ব্যাপারই নয়—ওরা যে-কোনো বয়সে যে-কোনো লোকের দায়িত্ব এমনভাবে নিতে পারে যে ছেলেদের পক্ষে তা কল্পনার বাইরে। কোন্ সময়ে কোন্ সোয়েটার পরবে—কখন পড়াশুনা করবে—কত রাত অবধি জেগে থাকবে সব এলা রাকেশকে বলে দেয়। ওর স্কুলের মাদার এবং মিস্ট্রেসরা ওকে যা শেখান—এলা সরাসরি তার সমস্ত নতুন শেখা জ্ঞান তার বাবার ওপরে প্রয়োগ করে। রাকেশ যেন এলার মাধ্যমে নতুন করে বড় হচ্ছে—সেই ছোটবেলার হো-হো-হাসির দিনগুলোতে ফিরে গেছে—একটি এক বছরের কৃষ্ণচূড়া গাছের মতো নতুন সবুজ ফিন্‌ফিনে পাতায় ও নতুন করে ভরে উঠছে।

চিঠিটা খুলে ফেলল রাকেশ।

"সোনা বাবা,

BANGLADARSHAN.COM

এতদিনে তোমার প্রথম চিঠিটা পেলাম।

আমি আমার সব বন্ধুদের বলেছি যে, তুমি বাঘডুম্বার ডাক শুনেছ। ওরা বিশ্বাসই করে না। খালি হাসে আর চার-পাঁচজনে একসঙ্গে হলেই বলে কিরি-কিরি-কিরি-কিরি ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। আমি বলেছি, আমার বাবা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে?"

এই অবধি পড়ে রাকেশ মনে মনে হাসল। ভাবল, সত্যি, এই বয়সটাই ভাল—যে বয়সে মন থেকে নির্মমভাবে বিশ্বাস করা যায় যে কারো বাবা মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তারপর যখন সেই বয়সে পা দিতে হয়—যখন এক এক করে সব পুরনো জানাগুলোকে পুরনো বিশ্বাসগুলোকে শক্ত হাতে রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবার দিন আসে—সে বড় দুঃখের সময়। তখন নতুন করে জানতে হয় যে বাবা, তার বাবা এবং তার বাবা বরাবর অবহেলায় মিথ্যা কথা বলে এসেছেন এবং বংশপরম্পরায় নিজেরা মিথ্যা কথা বলে ছেলেদের সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছেন। এখন এলার সেই বয়স, যে বয়সে কেউ বিশ্বাস করে না, করতে পারে না যে তার বাবাও মিথ্যা কথা বলে। ঈশপ ফেবল্‌সের গন্ধ এখনো এই বয়সের গায়ে লেগে থাকে।

আবার পড়তে লাগল রাকেশ।

"বাঘডুম্বার কথায় আমার একটা কথা মনে হয়েছে। মনে হয়ে খুব ভয় হয়েছে। তুমি তো বাঘ মারতে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও—যদি কোনোদিন তোমার কিছু হয়! মানে, বলতে নেই—ভগবান খুব ভাল—তোমার তেমন

কিছু কখনো হবে না–তবুও ভয় লাগে–যদি বাঘের হাতে তোমার কিছু হয় তাহলে তুমি ও কি বাঘডুম্বা হয়ে যাবে? সোনা বাবা, আমার ভীষণ ভয় করে। আমার তো আর কেউ নেই তুমি ছাড়া–তোমার কিছু হলে স্কুলের ছুটিতে আমি কার কাছে গিয়ে থাকত? তুমি না থাকলে আমি কি করব বাবা? মা'র ছবির মতো তুমিও তো আমার কাছে শুধু একটা ফটো হয়ে যাবে। আমি কাঁদলেও, ডাকলেও, আর তো তুমি কথা বলবে না। জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া ভালো বাবা, কিন্তু তুমি আর বাঘ-টাঘ মেরো না। মারবে না তো?

শ্রুতি মাসীকে আমার কথা বোলো। অর্জুন মেসোকেও। তুমি জঙ্গলে রয়েছো। দিল্লিতে জ্যাকির দেখাশোনা ঠাকুর সিং ঠিকমতো কচ্ছে তো? অবশ্য শীতকালে জ্যাকি দিল্লিতে ভালই থাকে, গরমের সময়েই ওকে নিয়ে মুশকিল।

আজকে এই থাকল। তুমি আবার চিঠি দিয়ো। কাল আমাদের উইক্‌লি পরীক্ষা। পড়তে হবে। চলি।

ইতি তোমার–এলাবুড়ী"

রাজুয়াড়ু ভিতর থেকে ডাকল, বলল, খানা লগা দিয়া।

ওরা সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেল।

যেতে যেতে শ্রুতি বলল, এলা কি লিখেছে?

রাকেশ উত্তর না দিয়ে চিঠিটা শ্রুতিকে দিল।

BANGLADARSHAN.COM

॥এগারো॥

বাংলো থেকে ওরা সাড়ে তিনটেতে বেরিয়েছিল। এখন সাড়ে চারটা বাজে।

সকলে মাচায় বসে গেছে। ওদের বসিয়ে দিয়ে দুর্গা, গঙ্গাধর, বাইধর, জগবন্ধু—ওরা সকলে কথা বলতে বলতে বাংলোয় ফিরে গেছে। গাড়িটা রাস্তায় পার্ক করানো আছে।

রাকেশের মাচায় শ্রুতি বসেছে। অন্য মাচায় সুব্বল আর অর্জুন। শ্রুতি ফিসফিস করে বলল, কফি খাবেন?

রাকেশ বলল, না। পরে। চুপ করে বসে থাকো।

শ্রুতি রাকেশের মুখের দিকে তাকালো। রাকেশ শরীরটাকে হেলা করে চলে। কিন্তু তাকে কেমন যেন ভাল লাগে তার মনের জন্যে। অর্জুনের বুকে শুয়ে আদর খেতে খেতে কখনো যে শ্রুতির রাকেশের কথা মনে পড়ে না, তা বললে মিথ্যে বলা হয়।

রাকেশ একদৃষ্টে মড়িটির দিকে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে অতি ধীরে চুলবুল করে মাথাটি এপাশে ওপাশে ঘুরাচ্ছে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে—ওর প্রতিটি ঘাস, পাতা, গাছকে চোখ দিয়ে ও চিরে চিরে দেখছে। সেই মুহূর্তে, সেই শীতের বনের বিধুর বিকেলে রাকেশের পাশে মাচানের উপরে বসে ভীষণ ভাল লাগছিল শ্রুতির। অর্জুনের সঙ্গে বিয়ের পর, এত কাছে এত নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে, এত নিবিড় নির্জনতায় শ্রুতি রাকেশের কাছে আর কখনো আসেনি। ঝুপরি ঝুপরি পাতার আড়াল দিয়ে পশ্চিমের সিঁদুরে আকাশ দেখা যাচ্ছে এক চিল্‌তে। সেই পটভূমিতে রাকেশের উদ্ধত চিবুকসমেত মুখটি দেখা যাচ্ছে। কানের কাছ অবধি টুপিটা নামানো রয়েছে। আজ রাকেশ বোধ হয় দাড়ি কামায়নি। তার গালে একটি সবুজাভা ফুটে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

মাচার চারপাশ থেকে জঙ্গল ঘিরে নানারকম শব্দ উঠছে। কত রকম পাখি, কত রকম পোকা কত কি ভাষায় কথা বলছে। কী একটা পাখি টাকুর-টুসি টাকুর-টুসি করে ডেকে চলেছে। যদিও অনেক শব্দ আছে চারিদিকে, যদিও এখনো অন্ধকার হয়ে আসেনি—তবু শ্রুতির কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করছে। মৃত মোষটাকে দেখা যাচ্ছে মাচা থেকে। মাঝে মাঝে একটি উৎকট গন্ধ আসছে। ঝর্নাটি বয়ে চলেছে কুলকুল কুলকুল একটানা আওয়াজ করে।

শ্রুতি আবার রাকেশের মুখের দিকে চাইল। আজ রাকেশ নায়ক। আজ সন্ধ্যেবেলা যে নাটক—যে একাংকিকা নাটক সম্পাদিত হবে তা কেবলমাত্র দুটি পুরুষ চরিত্রের। রাকেশ আর বনের রাজা বাঘ। শ্রুতিও মঞ্চে উপস্থিত, কিন্তু তার কোনো ভূমিকা নেই। সে রাকেশের মতো শিকারী নয়, সে রাকেশের স্ত্রী নয়, জীবনসঙ্গিনী নয়, সে কেবল রাকেশকে ব্যথা দিয়েছে। কথার মারপ্যাঁচে ঠকিয়েছে—মিষ্টি মুখ দূরে রেখেছে। আর এই সরল রাকেশ তার কাছে ভীরুর মতো কেবল আঘাতের পর আঘাতই সয়েছে। তবু তাকে আরো বেশী করে ভালবেসেছে।

কেন জানে না, সেই মুহূর্তে শ্রুতির মন কী এক বেদনায় হঠাৎ দ্রবীভূত হয়ে গেল–রাকেশের প্রতি সমবেদনায় তার সমস্ত সত্তা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার খুব ইচ্ছে করল, যে দান সে কোনোদিন রাকেশকে দেয়নি–অথচ যে দান সে অবহেলায় ইদানীং অনুক্ষণ অর্জুনকে দিচ্ছে, সেই দান এই সুন্দর অথচ ভয়ার্ত গোধূলি বেলায় রাকেশকে দেয় অথবা নিজে তা গ্রহণ করে! ওর মনে মনে মর্মরধ্বনি উঠল।

এমন সময় রাকেশ তার দিকে চাইল। আশ্চর্য! সে চাউনিতে কোনো চাওয়া নেই–এখন রাকেশের চোখে, রাকেশের মনে, মড়িতে-ফেরা বাঘ ছাড়া আর কিছু নেই। শ্রুতি হঠাৎ কুঁকড়ে গেল। ছিঃ, সে কি করতে যাচ্ছিল! সে না মেয়ে? মেয়েরা যে বরাবর পুরুষদের হারিয়ে এসেছে, সে তো কেবল নিজে থেকে কিছু না দিয়ে। কলেজে পড়ার সময় মায়ার খেলার গান গাইত শ্রুতি–"আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।" মনে পড়ে গেল শ্রুতির, নিজেকে ধন্যবাদ দিল নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেনি বলে।

এই রাকেশকে শ্রুতি শ্রদ্ধা করে। শুধু রাকেশ কেন, সব পুরুষকেই করে যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, সে যখন কাজ হাতে নেয় তখন তার স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা সকলকেই সে ভুলে যায়, সে তখন পার্থর মতো কেবল পাখির চোখই দেখতে পায়–সে তখন কর্তব্যে অটল, চরিত্রে দৃঢ়, কাজের পুরুষ। মেয়েরা বরাবর এই ক্ষণিক পুরুষকেই শ্রদ্ধা করে এসেছে, আর পুতুলের মতো খেলা করে এসেছে অবকাশের পুরুষকে নিয়ে, পুরুষের প্রেমিকা সত্তাকে নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ ফিসফিস করে শুধোল, শীত করছে?

শ্রুতি অস্ফুটে বলল, হুঁ। হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রাকেশ কথা না বলে শ্রুতির হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিল। নিজের হাতের চওড়া তেলোয় রেখে ধীরে ধীরে ঘষে ঘষে উষ্ণ করে দিল। তারপর মাথা নিচু করে শ্রুতির হাতটি নিজে নিজের মুখে, চোখের পাতায়, গালে বুলোল, কোমল কম্বলের কোণা দিয়ে ওর হাত দুটি ঢেকে দিল। যতক্ষণ রাকেশ এই সমস্ত করছিল, শ্রুরিস সমস্তক্ষণ রাকেশকে একবার আদর করতে ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে করছিল–কিন্তু অনেক কষ্টে, অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করল ও। কিন্তু ওর হাত দুটি কম্বলের নীচে ঢেকে দিয়েই রাকেশ হঠাৎ অভাবনীয় যা এত দিন এত বছরও করেনি তাই করে বসল। শ্রুতিকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে তার গ্রীবায়, চোখে ঠোঁটে দ্রুত চুমু খেয়ে চলল। শ্রুতির সমস্ত সত্তায় ঝর্নার শব্দ বাজতে লাগল–কুলকুল কুলকুল কুলকুল কুলকুল। কী এক আশ্চর্য আবিষ্কারে শ্রুতির শীতার্ত শরীর শিরশির করে উঠল। চোখ জলে ভরে উঠল। অর্জুন তাকে কাছে টানলে, কই, তার এমন তো কখনো মনে হয়নি। এমন করে তার সমস্ত শরীর-মন ভালো লাগায়, ভালোবাসায় পরিপ্লুত হয়ে যায়নি? এমন করে কখনো তো সে এমন শিউরে শিউরে ওঠেনি? এই সামান্য দানে যদি এত ভালো লাগা তো কেন এতদিন এত বছর নিজেকে এবং রাকেশকে এমন করে বঞ্চিত করে এসেছিল ও?

ভালো লাগায় শ্রুতি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। রাকেশ ওকে শুধু বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে বসে থাকল। শ্রুতি মাথাটি এলিয়ে রইল রাকেশের বলিষ্ঠ কাঁধে।

রাকেশ ফিসফিস করে বলল, ইস, এখনো তোমার হাত আগের মতো ঘামে?

শ্রুতি সোজা হয়ে বসে বলল, এখনও তো কত কিছুই হয় আগের মতো। সূর্য ওঠে—পাখি ডাকে।

শ্রুতি বলল, ওদের মাচা থেকে আমাদের মাচা দেখা যাচ্ছে—ও যদি দেখে থাকে?

হঠাৎ রাকেশ সেদিকে তাকাল। দেখল অর্জুন একদৃষ্টে ওদের মাচার দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু পাতার আড়াল থাকায় খুব সম্ভব এ মাচার কিছুই ও দেখতে পাচ্ছে না। রাকেশ কোনো কথা বলল না। শ্রুতির কথার জবাবও দিল না।

কফির ফ্লাস্কটা থেকে ঢেলে কফি নিয়ে নিজে নিল এবং শ্রুতিকে দিল। তারপর শ্রুতির চোখে ঠোঁট ছোঁয়াল।

তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর শ্রুতি বলল, বাঘ কখন আসবে?

রাকেশ বলল, জানি না। মাচায় এসে এত কথাবার্তা বলছি, বাঘ না আসার সম্ভাবনাই বেশী।

BANGLADARSHAN.COM

সেটা কি আমার দোষ?

রাকেশ বলল, না, আমার দোষ। সব আমার দোষ।

শ্রুতি কথা না বলে রাকেশের হাতে ওর হাতটি রাখল। স্বর্ণময়ী সন্ধ্যা সেই দুটি মহৎ মানুষের দিকে বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল।

অন্য মাচায় অর্জুন পা ছড়িয়ে বসেছিল; মাঝে মাঝে ফস্‌ফস্‌ করে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাচ্ছিল।

সুব্বল বলল, এমন করবেন না বাবু, এমন করলে বাঘ আর আসবে না।

অর্জুন বলল, তাতে আমার কি?

সে কি বাবু? বাঘ মারতে এলেন আর বলছেন আপনার কিছু নয়?

আমি বাঘ মারতে আসিনি। আসলে, ফর দ্যাট ম্যাটার, আজকে কেউই বাঘ মারতে আসেনি।

সুব্বল জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

অর্জুন ভাবল, আজকে শ্রুতিকে ছেড়ে দেবে না রাকেশ রায়। শালা বাঘ-মারা শিকারী। খুব রমদা-রমদি হবে। আমার ওয়াইফকে বাঘ মারা দেখাবে তুমি! কি আর করব—ছোটবেলা থেকে শহরের শিকারই শেষ করতে পারলাম না—জঙ্গলে আসার টাইম পেলাম কই? নইলে বাহাদুরির কি আছে? দাঁত বের করতে করতে, হ্যাঃ হ্যাঃ করতে করতে বাঘ এল, তাকে জার্মানীর তৈরী পাওয়ারফুল রাইফেল দিয়ে মাচায় বসে অন্য লোকের স্ত্রীর বুকে হাত রেখে গুলি করে দিলাম—আর সে শালা হতভাগ্য গুলিখোর বাঘ মরে গেল। এতে বাহাদুরির কি আছে তা তো আমি জানি না! শালা বাঘমুণ্ডা!

তারপর অর্জুন সুব্বলকে বলল, বাঘমুণ্ডা কোথায় জান?

না। সেটা কী জন্তু বাবু? একরকমের বাঘ?

আরে না না, বাঘ নয়। বাঘডুম্বা ভূত। বলেই কিরি কিরি কিরি কিরি ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ আওয়াজ করে উঠল আস্তে আস্তে।

সুব্বল অবাক হয়ে বলল, এই ডাক তো শুনেছি বাবু!

শুনেছ? কোথায়?

BANGLADARSHAN.COM

আমরা যখন বাইসন মেরে ফিরে আসছিলাম তখন।

আমরা মানে? সঙ্গে রাকেশবাবুও ছিল?

হ্যাঁ, বাবু তো ছিলই। বাবু টর্চ দিয়ে কত খুঁজলেন গাছে।

তাই বুঝি? অর্জুন মনে মনে বলল, শালা বেমালুম চেপে গেছে। শালা বাঘডুম্বা! নিজের পেছনে বাতি ফেলে কে আর কবে নিজেকে চিনেছে?

অর্জুন ফ্লাস্ক খুলে গেলাসে ঢালতে লাগল।

সুব্বল বলল, কি বাবু? চা?

ভাগ্। চা! সান-ডাউনের পর চা খাই না আমি। হুইস্কির সঙ্গে জল মেশানো আছে। তোর রাকেশবাবুকে একটু দিয়ে আসবি নাকি?

বাবু শিকারের সময় ওসব খান না। শিকার কি খেলার জিনিস বাবু? শিকার সাধনার জিনিস।

অর্জুন বলল, যা বলেছো। সাধনা না করলে সিদ্ধিলাভ হয়?

সেই শেষ কথা। তারপর অর্জুন যতক্ষণ মাচায় ছিল আর একটিও কথা বলেনি সে। খালি ধীরে ধীরে ফ্লাস্ক থেকে পানীয় ঢেলেছিল আর চুমুক দিয়েছিল।

সুব্বল দেখল সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখনো বাঘ এলো না। ওর টর্চের ক্ল্যাম্পটি ঠিকমতোই লাগানো আছে– রাকেশের বন্দুকে ফিট করা আছে। নিথর হয়ে বসে রইল সুব্বল। সুব্বল ভাবল, আজ আর বাঘ আসবে না।

সূর্য সবে ডুবেছে–পাখিদের সব ডাক থেমে গেছে। এমন সময় ডুঙ্‌রি পাহাড়ের দিক থেকে এসে একটা কোটরা খুব ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে ঝর্নাটার পাশ ঘেঁষে চলে গেল। দূরের শিমূল গাছ থেকে একটি ময়ূর হঠাৎ কেঁয়া-কেঁয়া করে উঠল।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘন কালো অন্ধকার। শ্রুতি চারিদিকে চেয়ে দেখল। চোখ চাওয়া যায় না। অন্ধকারে চাইলে অন্ধকার চোকে থাবড়া মারে। সে অন্ধকারে চাইলে চোখ ব্যথা করে। শ্রুতি মাথা তুলে ওপরের দিকে চাইল।

ওপরে তারাভরা আকাশ। কালপুরুষ কোমরে তরোয়াল নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যাতারাটি স্নিগ্ধ সৌকুমার্যে প্রসন্ন প্রদীপের মতো জ্বলছে। একমাত্র উপরে তাকালেই আলো দেখা যায়। ভাল লাগে।

রাকেশ অনেকক্ষণ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনছিল ঘাসের মধ্যে–ফিসফিসানির মতো। কিন্তু ঝর্নার শব্দে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছিল না। হঠাৎ মড়ির কাছে একটা স্পষ্টতর আওয়াজ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মড়ির দুর্গন্ধটি অনেক তীব্র হয়ে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আরো কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রাকেশ, তারপর বাঁ হাতটি আলতো করে শ্রুতির গায়ে ছুঁইয়ে ওকে স্থির হয়ে বসতে ইসারা করে, নিঃশব্দে রাইফেল তুললো। হাল্কা থার্টি-ও-সিক্স রাইফেল তুলে আন্দাজে ঐদিকে নিশানা করতে সময় লাগল না এবং যেই মড়ির কাছের ঘাসে আবার একবার হ্যাঁচড়ানোর আওয়াজ শোনা গেল, রাকেশ ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো ক্ল্যাম্পের সুইচটি টিপল। কিন্তু আলো যেখানে পড়ল সেখানে বাঘ কি মড়ি কিছুই দেখা গেল না। চকিতে ব্যারেলটি ঘুরিয়ে আন্দাজে মড়ি যেদিকে ছিল সেদিকে আলো ফেলতেই রাকেশের আলো একটি লম্ফমান বাঘের সোনালী ও সাদা ডোরাকাটা শরীরে পড়ল–মুহূর্তের মধ্যে রাকেশ গুলি করল এবং বাঘটি প্রচণ্ড হুঁয়াও আওয়াজ করে আলোর বৃত্তের বাইরে লাফিয়ে চলে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

সুব্বলও দেখতে পেয়েছিল। সুব্বল নিজের আলো জ্বালেনি। কারণ একসঙ্গে দুটি আলো জ্বালালে বাঘ হয়তো দাঁড়াত না। মানে বাঘ দাঁড়াবে ভেবেছিল সুব্বল, কিন্তু বাঘটি দাঁড়াল না মোটে। সুব্বলের মনে হলো, গুলিটা পেটে বা কোমরের নীচে কোথাও লেগেছে। ভাল জায়গায় লাগেনি। যে সময় গুলি হয়, সে সময় বাঘের বুক কিংবা গলা কিংবা মাথা কিছুই আলোয় দেখা যাচ্ছিল না।

গুলির আওয়াজের পর অর্জুন কথা বলল, কী হলো? বাঘ মরেছে?

সুব্বল বলল, মরবে, তবে কাল এ বাঘ নিয়ে কপালে ভোগ আছে।

কেন?

বাঃ, এই খণ্ডিয়া বাঘকে খুঁজে বের করে মারতে হবে না?

অর্জুন বলল, তাই বুঝি রেওয়াজ? খণ্ডিয়া বাঘ মানে কি? ইনজিওরড্?

গুলি-লাগা বাঘ। খণ্ডিয়া বাঘকে খুঁজে বের করে মারার সময়ই তো পরখ হয়, কে কত বড় শিকারী।

অর্জুন একটা হেঁচকি তুলল, বলল, রিয়্যালি? বহুৎ আচ্ছা।

BANGLADARSHAN.COM

॥বারো॥

ওরা খেসে বসেছিল।

স্যালাডের ডিসটি এগিয়ে দিতে দিতে শ্রুতি বলল, আমরা যে নেমে এলাম মাচা থেকে, বাঘ যদি তখন নীচে বসে থাকত?

রাকেশ বলল, হয়তো থাকতে পারত–কিন্তু আমরা যথাসম্ভব সাবধান হয়ে এবং গুলি করার প্রায় এক ঘণ্টা পরে নেমেছি। তবুও হয়তো থাকতে পারত।

অর্জুন বলল, স্টম্যাক শট খুব পেইনফুল, না? বাঘটার এখন নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

রাকেশ বলল, তা হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে বল? কাল সকালেই খুঁজে বের করে আমাদের তাকে মারতে হবে।

আপনার কি মনে হয় পায়ে হেঁটে আহত বাঘ মারা ঠিক হবে, ঐ লাইট রাইফেল দিয়ে? সুব্বল আমাকে বলছিল যে, তা নাকি খুব রিস্কি হবে।

রাকেশ বলল, না না। ঐ রাইফেল নিয়ে যাব না। ফোর-সেভেনটি-ফাইফ নিয়েই যাব।

সে রাইফেলের তো ডানদিকের ব্যারেলই ফোটে না বলছিলেন।

ডানদিকের ব্যারেল নাই বা ফুটল, এ রাইফেলের একটা গুলিই যথেষ্ট—যে যত বড় বাঘই হোক না কেন। তুমি তো এসব বোঝো অর্জুন, দেখো না রাইফেলটা কিছু করতে পারো কিনা?

শ্রুতিও বলল, হ্যাঁ, দেখো না। নইলে এক ব্যারেল ভরসা করে অত বড় আহত বাঘকে মারতে যাওয়া মানে প্রাণ হাতে করে যাওয়া।

অর্জুন শ্রুতির দিকে একবার তাকাল, তারপর মাংস চিবোতে চিবোতে বলল, বলছ?

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ, বলছি।

অর্জুন বলল, খাওয়ার পর আমাকেও রাইফেলের স্ট্রাইকিং পিনের অ্যাকশনটা বুঝিয়ে দেবেন রাকেশদা, আমি দেখি কী করতে পারি।

রাকেশ বলল, আচ্ছা।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুনের লাল চোখ জ্বলছিল লণ্ঠনের আলোয়। অর্জুনের মাথার মধ্যেও আগুন জ্বলছিল। বাঘটার খুব লেগেছে, ভাবছিল অর্জুন। পেটে গুলি লেগেছে। অর্জুনেরও পেটে গুলি লেগেছে আজ। পেটে গুলি খাওয়া বাঘ কাউকে ক্ষমা করে না। লণ্ঠনের আলোয় ওদের ছায়াগুলি সাদা দেওয়ালে লাফালাফি করছিল—আর অর্জুনের বাঘটির কথা মনে হচ্ছিল। বাঘটা বোধ হয় এখন কোনো ঘাসবনে, কি কোনো গুহায় এই নড়াচড়া-করা কালো ভুতুরে ছায়ার মতো অন্ধকারে গড়াগড়ি দিচ্ছে, রাকেশকে অভিশাপ দিচ্ছে।

শ্রুতি যে এতখানি বাড়াবাড়ি করবে বুঝতে পারেনি অর্জুন। শুধু রাকেশ নয়—শ্রুতিরও দোষ আছে। মাচায় কি ঘটেছে তা অর্জুন লক্ষ্য করেছে। এ. কে. সান্যাল কাউকে ক্ষমা করবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাকেশ রাইফেলটা এনে অর্জুনকে দেখিয়ে দিল কি করে ট্রিগার টানলে, স্ট্রাইকিং পিনটি গর্ত থেকে সামনে বেরিয়ে এসে কার্টিজের পেছনে স্ট্রাইক করে। অর্জুন একটি সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে মনোযোগ সহকারে দেখে নিল, ডানদিকের পিনটা পুরোটা বাইরে আসছে না।

রাকেশ বলল, রাইফেলটা রইল। তুমি যদি কিছু করতে পারো তো দেখ, নইলে এই খাবার টেবিলেই রেখে দিও, কাল সকালে আমি নিয়ে নেব। আজ আমার ভাল ঘুমের দরকার।

শ্রুতি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল।

সেদিন ও বড় সুখে ঘুমোবে বলে ঠিক করেছিল। কম্বলের নীচে শুয়ে শুয়ে সেদিন ও কোনো মিষ্টি দুষ্টু স্বপ্ন দেখবে ভেবেছিল, এমন সময় অর্জুন ঘরে এল। ওর খাটের কাছে এল, কোনো কথা না বলে একটানে ওর গা থেকে কম্বলটি টেনে মাটিতে ফেলে দিল।

শ্রুতি রেগে বলল, এ কী অসভ্যতা? আমার শীত করছে।

অর্জুন চোখ দিয়ে শ্রুতিকে কি যেন বলল; মুখে বলল, এখানে এসো।

শ্রুতি পড়ে-যাওয়া কম্বলটি টেনে তুলতে তুলতে বলল, না, তুমি যা-ই বল, আজকে না।

অর্জুন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ আজকে—জীবনে আর কোনোদিন আসো কি না আসো, আজকে এসো; প্লিজ, আজকে এসো।

কী যেন হয়ে গেল শ্রুতির। প্রথমে অর্জুনকে একটু অস্বাভাবিক লাগল, তার পরক্ষণেই শ্রুতি কি যেন ভেবে অর্জুনের কাছে উঠে এল।

অনেকক্ষণ থেকে লণ্ঠনটা দপ্‌দপ্‌ করছিল—বোধ হয় তেল ছিল না। হঠাৎ দপ্‌ করে সেটা নিভে গেল।

অর্জুন শ্রুতিকে দেখতে পাচ্ছিল না। মাচায় বসে অন্ধকার রাতের বনকে যেমন দেখাচ্ছিল, অর্জুনের চতুর্দিকে, ঘরে তেমন অন্ধকার ছেয়ে ছিল। মানুষখেকো বাঘ কোনো মৃতদেহকে যেমন করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, কোনো দয়া না করে, কোনো মমতা না রেখে, অর্জুনের ইচ্ছে করছিল শ্রুতিকে তেমন করে ছিঁড়ে ফেলে—শ্রুতিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। পেটে গুলি খাওয়া বাঘের মতো নীরব যন্ত্রণায় অর্জুন কেঁপে কেঁপে উঠছিল এবং শ্রুতির শ্রান্ত শরীরটা তার লব্ধ শিকারের মতো আক্রমণ করে আনন্দিত হচ্ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি চোখ বুজে ছিল। এত সুখে কোনোদিন শ্রুতি স্বপ্ন দেখেনি। তার শরীরের শাখায় কি মনের মুকুলে তখন অর্জুন একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। অর্জুনের পরশ, অর্জুনের আদর, অর্জুনের নিঃশ্বাস সেদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে হচ্ছিল শ্রুতির। শ্রুতি চোখ বুজে শুধু রাকেশকে দেখতে পাচ্ছিল অর্জুনের জায়গায়। শ্রুতি শরীর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছিল সে-মুহূর্তে—তাই অর্জুনের আক্রমণ তাকে আক্রান্ত না করে এক পরম পবিত্র তৃপ্তির তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

রাকেশ পাশ ফিরে শুয়ে ওর হাতে শ্রুতির ঘামে-ভেজা সুন্দর উষ্ণ আঙুলগুলি ঘুমের মধ্যে অনুভব করছিল। জানালার ভাঙা শার্সি দিয়ে আকাশভরা তারা রাকেশের স্বপ্নভোর মুখের দিকে চেয়েছিল। বাইরের অনাদি রাত, অশেষ মুহূর্তগুলিকে ঝরে-পড়া শিশিরের সঙ্গে একটি একটি করে গুণে চলছিল। রাকেশ পালকের গদীর মতো এক সুখের স্বপ্নে ডুবুরির মতো ডুবে যাচ্ছিল।

বাঘটা ঝর্নার পাশে বসেছিল—চক্‌চক্‌ করে জল খেয়েছিল। সমস্ত গায়ে রক্ত লেগে চ্যাটচ্যাট করছিল। বাঘটা হাঁপাচ্ছিল—বাঘটার আবার পিপাসা পেল। বাঘটা আবার জল খেলো। তারপর আহত শরীরটাকে টেনে টেনে

কোনোরকমে ঝর্নার পাশের নিচু নালায় বাঁশঝাড়ের আড়ালে একরাশ ঝরে-পড়া পাতার উপরে এসে শুয়ে পড়ল। সামনের দু থাবার উপরে মুখটা রেখে সামনে চেয়ে রইল—আততায়ীর আগমনের অপেক্ষায়। সেই ঘনান্ধকারেও দেখা যেতে লাগল, বাঘটার পেটটা ওঠানামা করছে। বাঘটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

অর্জুন শ্রুতিকে ছেড়ে উঠল, এক গ্লাস জল খেলো কাঁচের জাগ থেকে ঢেলে। টর্চটা জ্বালল।

শ্রুতি ওর বিছানাতেই কী এক তৃপ্ত বিভাসে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কম্বল গায়ে না দিয়েই। ওঘরে যাবার সময় অর্জুন শ্রুতিকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল, অর্জুনের মনে হলো শ্রুতি মরে গেছে। টর্চটা ভাল করে ওর মুখে ফেলল। নাঃ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কম্বল-ঢাকা বুক উঠছে নামছে।

অর্জুন ওঘরে গিয়ে টর্চ নিভিয়ে দিল। রাকেশের ঘরে যাবার দরজাটা নিঃশব্দে খিল দিয়ে দিল। তারপর আবার টর্চ জ্বেলে ওর স্যুটকেস থেকে টুল বক্স খুলে একটি ছোট উকো বের করল। সেটিকে নিয়ে এসে খাবার টেবলের পাশে চেয়ার টেনে বসল। রাইফেলটার লক খুলে, স্টক আর ব্যারেল আলাদা করে ফেলল। তারপর বাঁদিকের ব্যারেলের ট্রিগারটি টানল—স্ট্রাইকিং পিনটি কট শব্দ করে সামনে বেরিয়ে এল—তখন আস্তে আস্তে উকো ঘষতে লাগল অর্জুন তার উপর। ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে। অর্জুন একবার হাসল। দেওয়ালে তাকাল। লণ্ঠনের আলোর ছায়ায় তাকে আর তার হাতে-ধরা রাইফেলের কুঁদোটাকে ভূতের মতো মনে হচ্ছিল। অর্জুন উকোটি ঘষে চলল।

BANGLADARSHAN.COM

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ঘুমন্ত রাকেশের জীয়নকাঠি চুরি করে মরণকাঠি রেখে দিল অর্জুন। বাঁদিকের পিনটি প্রায় পুরো ঘষে ক্ষইয়ে দিয়েছে। এ রাইফেলের কোনো ব্যারেলেই আর গুলি হবে না। আপাতত পেটে গুলি খাওয়া বাঘের কাছে এই রাইফেল হাতে পৌঁছলে—রাকেশ রায়ের বাবার আশীর্বাদ, শ্রুতির ভালোবাসা কোনো কিছুই আর তাকে বাঁচাতে পারবে না।

রাইফেলটি আবার জোড়া লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে অর্জুন ঘর পেরিয়ে বাথরুমে গেল। বাথরুমের জানালাটা খোলা ছিল। ঝুপরি আমগাছটা দেখা যাচ্ছিল। অর্জুন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবে, এমন সময় কাছের কোনো গাছ থেকে হঠাৎ ডাকটা শুনল ও, কির-কির-কির-কির ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ। অর্জুন চমকে উঠল। তারপরই সেই ঘুমন্ত বাংলোয় নিশুতি রাতে খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসী অর্জুনের গা ছমছম করে উঠলো। সে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দৌড়ে এসে শ্রুতিকে ঠেলে তুলল, বলল, নিজের খাটে যাও, এই, নিজের খাটে গিয়ে শোও।

শ্রুতি ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে উঠে বসল, ডান হাতে মাথা চুলকোলো, তারপর ঘুমের ঘোরেই উঠে ওর নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে শ্রুতি মনে মনে নিরুচ্চারে বলল, আমার বিছানাটা একেবারে ঠাণ্ডা করে রেখেছো কেন? তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। অর্জুন, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। তোমার মধ্যে আর একটুও উষ্ণতা নেই। তুমি এই বিছানার মতো শীতল হয়ে গেছ।

॥তেরো॥

ভোর হয়ে গেছিল।

বাঘটা সারারাত বাঁশপাতায় গড়াগড়ি দিয়েছে। সমস্ত জায়গাটা রক্তে থক্‌থক্‌ করছে। বাঘটার চোখ লাল হয়ে গেছে–ঘোলা হয়ে গেছে। কোথাও কোনো নিরালা গুহায় গিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে বাঘটার। দু'একটা করে মাছি পড়তে আরম্ভ করেছে। একটা শকুন ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে কুচিলা গাছে বসেছিল, বসে বাঘটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বাঘটা ঘৃণায় ঘোঁৎ করে উঠেছিল। বড় বড় কুৎসিৎ ডানা ঝটপট করে শকুনটা উড়ে গেছিল।

বাঘটা আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল যে, ও আবার আসবে, নিশ্চয়ই সদলবলে আসবে।

বাঘটা যখন ছোট ছিল তখন ওর মায়ের সঙ্গে টুল্বকার জঙ্গলে প্রথম প্রথম শিকার করা শিখেছিল–বাঘটার সেই সময়ের কথা মনে পড়ছিল। বাঘটা গোঙাচ্ছিল যন্ত্রণায়। গত বছর কুরাপের কাছে মে মাসে এক বাঘিনীর সঙ্গে পনেরো দিন একসঙ্গে ছিল বাঘটা। সেই সব জ্যোৎস্নারাতগুলির কথা মনে পড়ছিল বাঘটার। ছেলেমানুষ বাঘিনীটি বেশ দেখতে ছিল–খুব সপ্রাণ ছিল। কে জানে, তার শরীরের শরিক তার বাচ্চাদের নিয়ে সে বাঘিনী এখন কেমন আছে! সেও কোনো শিকারীর গুলি খেয়েছে কিনা!

BANGLADARSHAN.COM

বাঘটা একবার একটা ঘেয়ো লোমওঠা নুলো শম্বর মেরেছিল। গরমের দিনে। একটি মহুয়া গাছের নীচে। তার চলবার শক্তি ছিল না। সে বেচারি বসে বসে মহুয়া চিবোচ্ছিল, এমন সময় বাঘটি তার কাছে পৌঁছতেই সে ধড়ফড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পড়ে গেছিল। তারপর শম্বরটার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল–বাঘটার সেই শম্বরটার মুখের কথা মনে পড়ল।

বাঘটা থাবা দিয়ে বড় লাল সূর্যটাকে একটা বলের মতো নামিয়ে আনতে চেষ্টা করল, কিন্তু সূর্যটা শুনল না–সে ক্রমাগত বড় হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে গেল। বাঘটার আর লুকিয়ে থাকা হলো না। বাঘটা জীবনে এই প্রথমবার ভয় পেলো।

ভোর হয়ে গেছিল।

অর্জুন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। শ্রুতি বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরে মধ্যের ঘরে এল, তারপর রাকেশের ঘরের দরজা ঠেলে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। রাকেশও ঘুমিয়ে ছিল। জানালা দিয়ে আলো এসে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছিল। রাকেশ পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। রাকেশকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। শ্রুতি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে রাকেশের পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হয়তো সেই ভোরের বাতাস কানে কানে শ্রুতির আসার খবরটা দিয়ে থাকবে—রাকেশ হঠাৎ চোখ মেলে চাইল। অনেকক্ষণ শ্রুতির চোখের দিকে চেয়ে রইল। শ্রুতি হাসল। শুয়ে শুয়েই রাকেশ শ্রুতির একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকে রাখল। তারপর চোখে ছোঁওয়াল।

শ্রুতি প্রশ্রয়ের চোখে হাসল। বলল, ওঠা হবে না?

হবে।

বাইরে অনেক বেলা, রোদ উঠে গেছে।

রাকেশ বিছানায় উঠে বসে হাত দিয়ে ঠেলে কাঁচের জানালা দুটি খুলে দিল।

বাইরে চমৎকার রোদ। বাতাসে বাঁশপাতার গন্ধ ভাসছে। কত পাখি ডাকছে।

শ্রুতি বলল, বাইরেটা কী সুন্দর লাগছে, না?

দারুণ। আমার দারুণ ভাল লাগছে আজ।

কথা না বলে শ্রুতি কিছুক্ষণ বাইরে রোদে চেয়ে রইল, তারপর বলল, এবার উঠে পড়ুন। আমি চায়ের বন্দোবস্ত করছি।

BANGLADARSHAN.COM

ভোর হয়ে গেছিল।

সুব্বল পাহাড়তলি থেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে বদ্‌না হাতে গ্রামে ফিরছিল। ঘাসে ঘাসে শিশিরবিন্দুগুলি রোদে হীরের টুকরোর মতো জ্বলছিল—ও পায়ের নীচে হাজার হীরে মাড়িয়ে গ্রামে ফিরছিল।

সুব্বলের ভাল লাগছিল। রাতে ঘরে আগুনের মালসার পাশে ওর বৌয়ের গা ঘেঁষে শুয়েছিল সুব্বল।

সে বেটী কেবলি বলছে কাল থেকে, বাবু বাঘটা খণ্ডিয়া করেছে, তুই কেন মরতে যাবি সে বাঘ খুঁজতে? সুব্বল ভাবল, ও বাচ্চাবিয়ানো বেটী তার কি বুঝবে। সুব্বল কি করে তাকে বোঝাবে এর মজাটা—তেড়ে আসা বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে বাঘকে গুলি করে মারা যে কী আনন্দ তা ও কি করে বুঝবে? হ্যাঁ, বিপদ কি ঘটে না? মাঝে-মধ্যে ঘটে। তা ঘটুক—যেদিন ঘটবে সেদিন ঘটবে, তা বলে তার বৌয়ের উটকো ঊরুতে মাথা রেখে কঁকিয়ে কেঁদে ঘরে মরার চেয়ে অমন করে বাইরে মরা ঢের ভাল। মেয়েমানুষের জাত, ওরা খালি কাছা ধরে টেনে রাখতে শিখেছে পুরুষকে, ও কি বুঝবে খণ্ডিয়া বাঘের হুংকারের বুক-কাঁপানো আনন্দ?

ভারী ভাল লাগছে আজ সুব্বলের।

চা-খাওয়া শেষ করে রাকেশ বলল, চলো সুব্বল। সুব্বল তৈরী হয়েই বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিল। অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, উইস ইউ অল দি বেস্ট। রাইফেলটার কিছু করতে পারলাম না, স্যরি।

রাকেশ আর সুব্বল গাড়িতে গিয়ে উঠল। রাকেশ এঞ্জিন স্টার্ট করে শ্রুতিকে হাত নাড়ল। শ্রুতি বারান্দায় থামের পাশে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটা গড়িয়ে গেল—গাড়িটা যখন বাংলোর গেট অবধি পৌঁছে গেছে, তখন শ্রুতি পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, রাকেশদা, একটু দাঁড়ান।

গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শ্রুতি এক দৌড়ে ঘরে গেল। দ্রুত হাতে ওর হ্যান্ডব্যাগ খুলল, ডাইরিটা বের করল। ডাইরির ভেতরে একটি জবাফুলের পাপড়ি রাখা ছিল—পাতার ভাঁজে—ফিনফিনে কাগজের মতো হয়ে গেছিল। ফুলটি—মায়ের আশীর্বাদ ফুল—দিল্লি থেকে আসার আগে শ্রুতির মা শ্রুতিকে রাখতে দিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ফুলটি নিয়ে শ্রুতি দৌড়ে বাংলোর গেট অবধি চলে গেল।

রাকেশ শুধোল, কি ব্যাপার?

শ্রুতি বলল, এই যে, এটা বুকপকেটে রাখুন।

রাকেশ কথা না বলে ফুলটি নিল, নিয়ে বুকপকেটে রাখল; তারপর গাড়ির দরজায় রাখা শ্রুতির হাতে হাত দিয়ে একটু চাপ দিল। তারপরই শ্রুতি দেখল গাড়িটা লাল ধুলো উড়িয়ে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

বনে-পাহাড়ে তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। পাতায় পাতায় রোদ ঝিলমিল করছে। ধনেশ পাখিগুলো হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হঁক্ক হঁক্ক করছে পাহাড়ে। আজকের সকালের মতো সুস্থ সুন্দর সান্ত্বনার সকাল রাকেশের জীবনে বহুদিন আসেনি। তার শ্রুতি, তার চিরদিনের জন্মজন্মের শ্রুতির এতদিনে সংস্কার-মুক্তি ঘটেছে—যা হয়তো এই পরিবেশে না হলে সম্ভব ছিল না। কোনোদিন সম্ভব ছিল না। এই সকালের আকাশভরা রোদের মতো শ্রুতির অস্তিত্ব আজ রাকেশের শরীরে ও মনে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। পৃথিবীকে বড় ভাল লাগছে—বাঁচতে খুব ইচ্ছে করছে রাকেশের। অনেকদিন বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

গাড়ি ছেড়ে ওরা দু'জনে নামল। সুব্বলকে ওর দো-নলা চার্চিল শটগান দিয়েছে। ও নিয়েছে ফোর-সেভেনটি-ফাইভ রাইফেল। ডান ব্যারেল যখন কাজই করছে না, তখন সে ব্যারেলে আর গুলিই পুরল না। কেবল একটি গুলি রাখল বাঁ ব্যারেলে। বাঘ চার্জ করলে ভাল করে দেখেশুনে মারবে। এত বড় বাঘ জন্মায়নি এখনো যে এই রাইফেলের গুলি হজম করবে। তাছাড়া সুব্বল তো সঙ্গে আছেই।

ওরা দেখতে দেখতে মাচার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। খুব সাবধানে, খুন সন্তর্পণে। রাকেশের বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে একটু হেঁটেই। শ্রুতি বলেছে, আজ ফ্রায়েড রাইস রাঁধবে। আজ এই অর্ধসমাপ্ত কাজ ভালভাবে শেষ করে ভাল করে রেলিশ করে খাবে। আরাম করে শ্রুতির চোখের ছায়ায় বসে খাবে।

রক্ত দেখা গেল। ঘাসে ঘাসে রক্ত শুকিয়ে আছে। পাইপটাতে শেষ দুটো বড় বড় টান লাগিয়ে ছাই ঝেড়ে বুকপকেটে রাখল রাকেশ। সুব্বলের কাঁধ ধরে ফিসফিস করে বলল, তুমি টিলার ওপর দিয়ে যাও, আমি নিচুতে আছি। ওপর থেকে চারদিক ভাল করে দেখতে পাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না—দেখলেই গুলি করবে।

সুব্বল আলাদা হয়ে গিয়ে টিলায় চড়তে শুরু করল। টিলাটি ছোট কিন্তু প্রস্থে বেশ বড়। বেশীর ভাগই বাঁশ আর কুচিলার জঙ্গল—বড় বড় কালো কালো পাথর—ন্যাড়া ন্যাড়া।

এখন থেকে রাকেশ একা—একদম একা। রাকেশ রক্ত অনুসরণ করে এক-পা এক-পা এগিয়ে চলল। ও মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যে, বাঘটা যেন বেশীদূর না গিয়ে থাকে—তাড়াতাড়ি যেন বাঘটাকে মেরে ও ফিরে যেতে পারে শ্রুতির স্নেহছায়ায়, শ্রুতির ভালোবাসায়। এতদিন সে শুধু চেয়েছে। কালকে পাওয়ার আভাস মাত্র পেয়ে ওর মনে হচ্ছে যেন বরাবর এমনি পাওয়াতেই অভ্যস্ত ছিল। ওর অন্তরের শুকিয়ে যাওয়া ক্লান্ত কোষগুলি আবার নতুন করে ভরে উঠেছে। এখন আর নষ্ট করার মতো সময় নেই রাকেশের। এমন কি শিকার করেও নয়। এই শেষ শিকার।

বাঘটা একবার উপরে তাকাল। রোদের তেজ বেড়েছে। বাঘটা রোদের দিকে চাইতে পারছে না। উপরে তাকালেই শুধু হলুদ রঙ দেখতে পাচ্ছে বাঘটা; কানের কাছে কোনো ঝর্নার শব্দের মতো শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওর খুব পিপাসা পেয়েছে। জিভটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু উঠে আবার নালায় গিয়ে জল খাবার ক্ষমতাও নেই, উপায়ও নেই। বাঘটা সূর্যকে অভিশাপ দিচ্ছে—গতরাতের হঠকারিতাকে অভিশাপ দিচ্ছে। বাঘটার পেটটা উঠছে নামছে। এমন সময় সামনের শুকনো পাতা-বিছানো সুঁড়িপথে বাঘটা-মানুষের শব্দ শুনল।

BANGLADARSHAN.COM

রাকেশ সাবধানে এগোচ্ছিল। রক্তের রেখাটা বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে গেছে। এক জায়গায় অনেকখানি থক্‌থকে রক্তে কিছু বাঘের লোম দেখতে পেল। বাঘটা এখানে নিশ্চয়ই গড়াগড়ি দিয়েছিল। রাকেশ সামনের টিলার পাশঘেঁষা একটি উঁচু জায়গা দেখতে পেল। ঠিক করল ঐ জায়গায় পৌঁছে ভাল করে চারদিক দেখবে—বাঘটা খুব কাছাকাছি নিশ্চয়ই আছে।

একটা নীল কাঁচাপোকা গুনগুন করে বাঘটার নাকের সামনে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বাঘটার চোখ খুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু বাঘটা দেখছিল মানুষটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে—বাঁশঝোপের আড়াল দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। উত্তেজনায় বাঘটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দমকে দমকে টাটকা রক্ত বেরোতে লাগল। বাঘটা ঠিক করল, মানুষটা যেই সামনের ফাঁকা উঁচু জায়গাতে পৌঁছবে—টিলাটির পাশ ঘেঁষে—অমনি তাকে গিয়ে ধরবে। বাঘটা আবার উপরে তাকাল। আবার হলুদ রঙ দেখতে পেল। বাঘটা দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে ঘোলা আরক্ত চোখে সেই আগন্তুকের পথের দিকেই চেয়ে রইল।

শ্রুতি বাথরুমে চান করছিল। গ্রীবার সাবান মাখতে মাখতে গুনগুন করে গান গাইছিল। বাথরুমটা নোংরা, কোথাও বসবার জায়গা নেই। শ্রুতি বাথরুমের ছায়ান্ধকারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ দেখল। তারপর

চোখে হাত ছোঁয়াল। রাকেশদা কেবলি চোখে চুমু খায়, শ্রুতির হাতটি নিয়ে তার নিজের চোখে ছোঁয়ায়। কেন? চোখে কি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রুতি ভাবল—চোখ হৃদয়ের জানালা।

এমন সময় বাথরুমের দেওয়ালের পাশ থেকে কি যেন খুব জোরে কিরি-কিরি-কিরি-কিরি ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ করে উঠল। শ্রুতি চমকে উঠে ভয় পেয়ে ভিজে গায়ে কেঁপে উঠল—তার সিক্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। জানালার উপরের কাঁচ দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—অর্জুন হি-হি করে হাসছে। অর্জুনের চোখে শ্রুতির চোখ পড়তেই অর্জুন আবার চেঁচিয়ে উঠল—কিরি-কিরি-কিরি-কিরি ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ—তারপর বলল, বাঘডুম্বা।

শ্রুতি বলল, ভাল হবে না বলছি, আমাকে ভয় দেখিও না। আমার ভীষণ ভয় করে। আমাকে ভয় দেখিও না।

এই সব মুহূর্তে খুব বড় শিকারীরও ভয় করে। রাকেশ প্রায় সেই উঁচু জায়গাটায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় অতর্কিতে ডানদিক থেকে একটি প্রচণ্ড গর্জন করে বাঘটি ওর দিকে তেড়ে এল। তখনও প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল। বাঘটি আসতে পাচ্ছিল না—কোনোরকমে সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে পেছনের অংশটিকে টেনে এগিয়ে আসছিল—গুলিটি তলপেটে ঢুকে পেছনের একটি পা ভেঙে বেরিয়ে গেছিল। পারছিল না—তবুও তার অবনমিত পৌরুষের শেষ গর্বে সে তার আততায়ীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসছিল।

রাকেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তর্জনীটি পেছনের ট্রিগারে ছুঁইয়ে—সেফটি ক্যাচটি সামনে ঠেলে—বাঘটাকে আরো কাছে আসতে দিচ্ছিল। বাঘটা ওর শরীরের অক্ষমতার লজ্জা আকাশ-কাঁপানো হুংকারে ঢেকে এগিয়ে আসছিল। ওর পিঠে সকালের রোদ শ্রুতির ভালোবাসার মতো আশ্লেষে জড়িয়ে ছিল। উষ্ণতায় রাকেশ ভরে ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রুতি সারা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে ঠিক করে ফেলল, একদিন তার এই শিউলি শরীর সম্পূর্ণভাবে রাকেশদাকে দান করে দেবে। রাকেশদা কি করে তাকে আনন্দে আদর করে, তা নিজের শরীর ছেড়ে বাইরে এসে বসে বসে দেখবে। রাকেশদার সূর্যমুখী উষ্ণতাকে ও ওর যা-কিছু আছে সব দিয়ে ফুরিয়ে যাবে।

এবার রাইফেল তুলল রাকেশ। বাঘটা দশগজের মধ্যে এসে গেল। রাকেশ গুলি করল। কিন্তু বাঘটা তবুও অমনিভাবে মুহূর্তের মধ্যে এসে গেল। রাকেশ কিছু বুঝতে পারল না, গুলি হলো না। ও রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে বাঘটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু বাঘটা ওকে ধরে ফেলল। ধরে ওর ডান কাঁধে ও গলার মাঝামাঝি জায়গায় কামড় দিয়ে রাকেশকে এক ঝটকায় শুইয়ে ফেলে বাঘটা পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

অর্জুন বিয়ারের বোতলটা খুললো—বোতলটা কাত করে গেলাসে হলুদ বুড়বুড়ি কাটা বিয়ার ঢালতে ঢালতে বলল, শালা বাঘডুম্বা।

গুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। রাকেশের চোখ ঘোলা হয়ে এসেছিল। ও ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। রোদটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। ও বুঝতে পারছিল ওর সমস্ত শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে—সেই ঘোলা চোখেও সুব্বলকে দেখতে পেল—সামনের টিলার উপর বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। টিলা ও আকাশের পটভূমিতে।

গুড়ুম আওয়াজের পরই বাঘটা রাকেশের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাঘের মুখটা রাকেশের মুখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে স্থির হয়ে রইল মাটিতে। রাকেশের মনে হলো বাঘটা ওকে চুমু খাবে।

রাকেশ একবার সূর্যের দিকে তাকাল—ওর খুব শীত করছিল—দেখল সমস্ত আকাশে কে যেন সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনে, কালো রঙের সুতো টান-টান করে তাঁতে বসিয়েছে—শাড়ি বুনছে। রাকেশের খুব ঘুম পেতে লাগল। ওর ইচ্ছা করল বাঘটাকে কোল-বালিশ করে ঘুমোয়।

রাকেশের মাথার মধ্যে কে যেন সেতারে ধুন বাজাতে লাগল, ওর মাথায় কি যেন হতে লাগল। হঠাৎ রাকেশের মনে হলো, রুমনি একটি লাল ঢাকাই শাড়ি পরে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রুমনি খুব হাসছে। বিয়ের আগে ও যেমন ঝর্নার মতো হাসত—হাসতে হাসতে রুমনি আবার শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে রোদ্দুরে ভেসে ভেসে ফিরে গেল। জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

ঘুমে রাকেশের চোখ জড়িয়ে এল।

একটা করুন ‘কাঁচপোকা’ বুঁই-ই বুঁ-বুঁ-বুঁই-ই-ই করে একবার রাকেশের আর একবার বাঘটার মুখে উড়ে উড়ে বসতে লাগল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥